ঐতিহাসিক পাঠ

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

পঞ্চম সংস্করণ।

কলিকাতা,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীতারিণীচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৯।

মূল্য ।০ আট আনা।
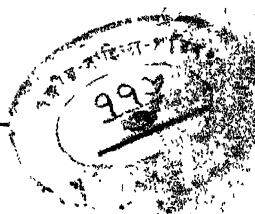
বিজ্ঞাপন।

ঐতিহাসিক পাঠ ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশ বা ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যাধিকারের ইতিহাস নহে। ইহা ভারতবর্ষের জনসাধারণের সাময়িক অবস্থার ইতিহাস। প্রাচীন সময় হইতে ইঙ্গ্‌রেজাধিকার পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ অবস্থার বিবরণ, এই গ্রন্থে সংক্ষেপে অথচ শৃঙ্খলার নিয়ম অনুসারে লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি। আর্য্যগণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভূখণ্ডে কিরূপে বসতিবিস্তার করেন, আর্য্যসভ্যতায় ভারতবর্ষের কিরূপ উপকার সংসাধিত হয়, আর্য্যদিগের প্রবর্ত্তিত নীতি সমাজের কিরূপ মঙ্গলসাধন করে, উপস্থিত গ্রন্থে তৎসমুদয়ের বিশদ বিবরণ দিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এই উদ্দেশ্যে রামরাবণ বা কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ অপেক্ষা আর্য্যদিগের সামাজিক অবস্থার বিবরণ বিস্তৃতরূপে লিখিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

রাজ্যলুব্ধ ব্যক্তির রাজ্যাধিকারের বিবরণ বা নরশোণিতপ্রিয় ব্যক্তির যুদ্ধজয়ের কথা প্রকৃত ইতিহাস নহে। দেশের সভ্যতা, রীতিনীতি ও লোকের অবস্থার বিবরণই প্রকৃত ইতিহাস। শিক্ষার্থিগণ, ভাষাশিক্ষার সহিত স্বদেশের এই সকল অত্যাবশ্যক বিষয় জানিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক পাঠ প্রণীত হইয়াছে। ঐতিহাসিক পাঠের অধ্যাপনা হইলে বোধ হয়, কিয়ৎপরিমাণে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইতে পারে।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

সুকুমারমতি বালকদিগের অনাবশ্যক বোধে এই সংস্করণে ঐতিহাসিক পাঠের কিয়দংশ পরিত্যক্ত ও আবশ্যক বোধে কিয়দংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অধিকন্তু, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের সুবিধার জন্য, বিষয়গুলি নির্দ্দিষ্ট শিরোনাম দিয়া সাহিত্যগ্রন্থের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া দেওয়া গিয়াছে।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

সূচী।

ঐতিহাসিক পাঠ।

আর্য্যদিগের বসতিবিস্তার।

অতি প্রাচীন সময়ে ভারতবর্ষে দুই শ্রেণীর লোক বাস করিত। আকারে, আচারব্যবহারে, এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে কোনও সাদৃশ্য ছিল না। প্রথম শ্রেণীর লোক আপনাদিগকে আর্য্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক অনার্য্য ছিল। ইহারা দস্যু বা দাস বলিয়া অভিহিত হইত। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, আর্য্য ও দস্যুদিগের মধ্যে অনেক বিষয়ে বৈষম্য ছিল। আর্য্যেরা সকলে সম্মিলিত হইয়া, আপনাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উৎকৃষ্ট প্রণালীর অবধারণ করিতে পারিতেন; দস্যুরা এরূপ এক উদ্দেশ্যে এক সূত্রে সম্বদ্ধ হইতে জানিত না। আর্য্যদিগের মধ্যে সমাজতন্ত্র ছিল, সকলে উৎকৃষ্টতর সামাজিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনাদের অবস্থার উৎকর্ষসাধন করিতে পারিতেন; দস্যুগণের মধ্যে এরূপ সমাজতন্ত্র ছিল না, সমাজের উন্নতির জন্য উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাও প্রণীত হইত না। আর্য্যগণ যুদ্ধের নিয়ম জানিতেন, উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগেও দক্ষ ছিলেন। দস্যুগণ সামরিক রীতি কিছুই জানিত না, তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রও উৎকৃষ্ট ছিল না। কোন বিষয়ে একবার অকৃতকার্য্য হইলে আর্য্যগণ আপনাদের বুদ্ধিবলে কৃতকার্য্য হইবার উপায়ের অবধারণ করিতেন, এবং অধ্যবসায়ের সহিত সেই উপায় অবলম্বন করিয়া সিদ্ধকাম হইতেন; দস্যুদিগের এরূপ বুদ্ধিবল ছিল না, সুতরাং তাহারা সকল সময়ে সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিত না।

আর্য্যগণ যুদ্ধে জয়লাভের জন্য দেবতাদিগের সহায়তাপ্রার্থনা করিতেন এবং জয়লাভ হইলে দেবতাদের প্রসাদে বিজয়-শ্রী অধিকৃত হইয়াছে ভাবিয়া, ভক্তিভাবে তাঁহাদের আরাধনায় নিবিষ্ট হইতেন; দস্যুদিগের এরূপ ঈশ্বরনিষ্ঠা ছিল না, তাহারা কেবল আপনাদের বাহুবলেরই গৌরব করিত। আর্য্যেরা সময়ে সময়ে প্রকাশ্য সমিতিতে সকলে একত্র হইতেন; এই সকল সমিতিতে সাহসী ও প্রতিভাশালী, সুযোদ্ধা ও সুকবিগণ সাধারণের নিকট প্রশংসা ও সম্মান পাইতেন, দস্যুদিগের মধ্যে এরূপ সমিতি ছিল না। আর্য্যগণ অরাতিদিগকে সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করিতেন, সম্মুখযুদ্ধ ব্যতীত ইঁহারা কোনরূপে শত্রুর অনিষ্ট করিতেন না, দস্যুগণ সকল সময়ে সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হইত না, তাহারা অনেক সময়ে লুক্কায়িত থাকিয়া, সুযোগক্রমে শত্রুপক্ষের খাদ্যসামগ্রী বা সম্পত্তিহরণ করিয়া বিঘ্ন জন্মাইত। আর্য্যগণ সুগঠিত, সুশ্রী, সুদীর্ঘ ও বলিষ্ঠ ছিলেন। দস্যুগণ খর্ব্বকায়, কদাকার ও নয়নের অপ্রীতিকর ছিল। সংক্ষেপে সভ্যতার আলোক আর্য্যদিগকে উদ্ভাসিত করিতেছিল; অসভ্যতার ঘোর অন্ধকার দস্যুদিগকে একবারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

দস্যুরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিত। লৌহ অস্ত্র ইহাদের অদ্বিতীয় সম্বল ছিল। ইহারা কটিদেশে একখানি ছোট ধুতি জড়াইয়া রাখিত। কোন কোন দস্যু অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল। ইহাদের সুরক্ষিত দুর্গ ও অনুচর থাকিত। ইহাদের সহিত যুদ্ধের সময়ে আর্য্যগণ আপনাদের আরাধ্য দেবগণের নিকট শক্তি ও সাহসপ্রার্থনা করিতেন।

আর্য্যেরা যে যে স্থানে বসতিবিস্তার করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানেই দস্যুরা তাঁহাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইল। ইহারা আর্য্যদের নিকট সহজে মস্তক অবনত করিল না। সকলেই আপনা-

দের স্বাধীনতারক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। আর্য্যগণ এই অসভ্যদিগের সাহস দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা আপনাদের অধ্যুষিত স্থান নিরাপদ রাখিবার জন্য ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। তাঁহাদের সৈন্যগণ প্রধানতঃ পদাতিক ও অশ্বারোহী, এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া অনেকগুলি দল সংগঠিত হইল। প্রতিদলের এক এক জন সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। ইঁহারা অশ্বচালিত যুদ্ধরথে আরোহণ করিয়া শঙ্খধ্বনি পূর্ব্বক সমরদেবতার স্তুতি-গীতি গান করিতে করিতে আপনাদের সৈন্যচালনা করিলেন। ভিন্ন ভিন্ন পতাকা সকল ভিন্ন ভিন্ন সৈনিক দলে শোভা পাইতে লাগিল। সৈন্যগণের কেহ ধনু ও তীর, কেহ বড়শা বা তরবারি লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সেনাপতিগণ আপনাদের সৈন্যদল সমভিব্যাহারে ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাইয়া দস্যুদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। দস্যুরা ইঁহাদের পরাক্রম সহিতে পারিল না, আপনাদের শস্যপূর্ণ গ্রাম বা নগর ছাড়িয়া চারি দিকে পলাইতে লাগিল। অনেকে তরবারির মুখে সমর্পিত হইল। অনেকে পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক নানাবিধ উপহার দিয়া বিজেতাদিগকে পরিতুষ্ট করিল। দস্যুদিগের যে সকল জনপদ অধিকৃত হইল, আর্য্যগণ তৎসমুদয়ে বসতিস্থাপন করিলেন। এইরূপে অসভ্য দস্যু জনপদে আর্য্যরীতিনীতি প্রবর্ত্তিত হইল; আর্য্যদেবগণ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। প্রত্যেক সেনাপতি আপনাদের অধিকৃত এক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া উঠিলেন। এই যুদ্ধ এক দিনে শেষ হইয়া যায় নাই। এক দিনে সমস্ত দস্যুজনপদ আর্য্যদিগের অধিকৃত হয় নাই। এ যুদ্ধ বহুকাল চলিয়াছিল, বহুকাল ভারতের এই অসভ্য জাতি, প্রবল পরাক্রান্ত, সহায়সম্পন্ন আর্য্যদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। শেষে যখন ইহাদের জয়-

লাভের আশা নির্ম্মূল হইল, তখনও সকলে আর্য্যদিগের পদানত হইল না। কেহ কেহ আত্মীয়গণের সহিত দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে যাইয়া আপনাদের স্বাধীনতারক্ষা করিল,কেহ কেহ বা বিজন অরণ্য আশ্রয় করিয়া বাসকরিতে লাগিল। আর্য্যদিগের ইতিহাসে কোনও সময়ে এই জাতি একবারে পদানত হয় নাই। এখন ভারতবর্ষে গারো, সাঁওতাল, কোল, ভীল, খন্দ, প্রভৃতি যে সকল অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জাতি দেখা যায়, সেই সকল জাতির লোক আদিম দস্যুদিগের সন্তান। এই দস্যুসন্তানগণ সাহসী, যুদ্ধকুশল ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। ইহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিলে ইহারা সদ্ব্যবহারকারীর বিশেষ অনুরক্ত হইয়া থাকে। লর্ড ক্লাইব প্রধানতঃ ইহাদের সাহস ও ইহাদের পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়াই দক্ষিণাপথের যুদ্ধে জয়ী হন, এবং পলাসীর রণক্ষেত্রে বিজয়শ্রী অধিকার পূর্ব্বক বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা, ব্রিটিশ কোম্পানির পদানত করেন।

আর্য্যগণ প্রথমে পঞ্জাবে বাস করেন। কিন্তু একেবারেই সমস্ত পঞ্জাব বা উহার বহিঃস্থ ভূভাগ তাঁহাদের অধিষ্ঠানভূমির মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। আর্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন দস্যুজনপদের অধিকারী হইলেও প্রথমে উত্তর ভারতের একটি বিশেষ ভূখণ্ডে বাস করিতেন। এই ভূখণ্ড ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে পরিচিত। ইহা সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী এবং দিল্লীর প্রায় এক শত মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। সরস্বতী বিনশননামক স্থানে বালুকাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। দৃষদ্বতী বর্ত্তমান সময়ে কাগার নাম ধারণ করিয়াছে। ব্রহ্মাবর্ত্তের দৈর্ঘ ৬৫ মাইল, বিস্তার ২০ হইতে ৪০ মাইল।

আর্য্যদিগের বংশ যখন ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ব্রহ্মাবর্ত্তে যখন তাঁহাদের সমাবেশ হইল না, তখন তাঁহারা দক্ষিণাভিমুখে

অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ব্রহ্মাবর্ত্তের পর তাঁহারা যে জনপদে বাস করেন, তাহার নাম ব্রহ্মর্ষি। উত্তর বিহার লইয়া গঙ্গা ও যমুনার উত্তরবর্ত্তী স্থান ব্রহ্মর্ষি প্রদেশের মধ্যে পরিগণিত। এই প্রদেশ চারি ভাগে বিভক্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল ও শূরসেন। কুরুক্ষেত্র সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী থানেশ্বরের নিকট, মৎস্যদেশ এই কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে এবং মথুরার ৮৩ মাইল পশ্চিমে, কেহ কেহ কহেন, বর্ত্তমান জয়পুর-রাজ্যের কোন কোন অংশ মৎস্যদেশের অন্তর্গত। পঞ্চালের বর্ত্তমান নাম কান্যকুব্জ বা কনৌজ, শূরসেন বর্ত্তমান মথুরা। ইহাতে দেখা যাইতেছে, বংশবৃদ্ধির সহিত গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রায় সমস্ত ভূভাগে আর্য্যদিগের বসতি বিস্তৃত হয়।

ব্রহ্মর্ষির পর আর্য্যেরা যে স্থানে আসিয়া বাস করেন, তাহার নাম মধ্যদেশ। মনুসংহিতার মতানুসারে মধ্যদেশ হিমালয় ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্ত্তী।

মধ্যদেশের পর আবার বসতিস্থানের সীমাবৃদ্ধি হইল। আর্য্যদিগের বংশ যখন এত বাড়িয়া উঠিল যে, মধ্য দেশেও সকলের সমাবেশ হইল না, তখন তাঁহারা আপনাদের আবাসের জন্য চতুর্থ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। এই চতুর্থ স্থান আর্য্যাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ হইল। আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত, পূর্ব্ব সীমা কালকবন বা বর্ত্তমান রাজমহল পাহাড়, দক্ষিণ সীমা পারিযাত্র বা বিন্ধ্যপর্ব্বত এবং পশ্চিম সীমা আদর্শাবলী বা আরাবলী পর্ব্বত। ক্রমে আর্য্যাবর্ত্তের সীমা সম্প্রসারিত হয়। মনুসংহিতার মতে আর্য্যাবর্ত্তের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, পূর্ব্বে পূর্ব্ব সাগর দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি এবং পশ্চিমে পশ্চিম সাগর।

আর্য্যগণ যে, কেবল এই চারি স্থানেই আপনাদের বসতিস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা নহে। ক্রমে দক্ষিণাপথেও তাঁহাদের

বসতি বিস্তৃত হয়। এই সকল উপনিবেশস্থাপন ক্রমে ক্রমে হইয়াছিল। আর্য্যদিগের বংশবৃদ্ধির সহিত তাঁহাদের আবাস-স্থানের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে ছিল। এইরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি অল্প সময়ের মধ্যে হয় নাই। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে ও দক্ষিণাপথে বসতি-স্থাপন করিতে বহু বৎসর লাগিয়াছিল। আর্য্যগণ ভারতবর্ষে এক সময়েই সমুদয় স্থানে আধিপত্যস্থাপন করেন নাই।

আর্য্যগণ দস্যুদিগকে পরাজয় করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যস্থাপন করিলেন। প্রধান প্রধান আর্য্যভূপতি দরবারে উপস্থিত হইয়া যথানিয়মে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আরাধ্য দেবতার পূজায় ও পুরোহিতদিগকে ধনদানে তাঁহাদিগের ঔদাসীন্য ছিল না। সামন্তগণ তাঁহাদের সহচর ছিল। তাঁহারা এই সমস্ত সহচরে পরিবৃত হইয়া চারণদিগের মুখে প্রশংসা গীতি শুনিতে শুনিতে আপনাদের আড়ম্বরপ্রিয়তা দেখাইতেন।

প্রধান প্রধান আর্য্যভূপতি পরিষ্কৃত ও সুন্দর সুখে বাস করি-তেন। তিনি যথানিয়মে রূপলাবণ্যবতী কামিনীদিগকে বিবাহ করিয়া অন্তঃপুরে রাখিতেন। তাঁহার বহুসংখ্য অনুচর ও গৃহ-পালিত পশু থাকিত। দেব-সেবার উপলক্ষে তিনি সমৃদ্ধ ভোজের অনুষ্ঠান করিয়া সমাজে আপনার প্রতিপত্তিরক্ষা করি-তেন। তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণ তাঁহার প্রতি সাতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত। অগ্রে তিনি ভোজন-স্থানে উপবিষ্ট না হইলে কেহই ভোজন প্রবৃত্ত হইত না। আত্মপ্রাধান্য ও সমাজে আপনার ক্ষমতারক্ষার জন্য তিনি সর্ব্বদা অনুচরবর্গের সহিত প্রস্তুত থাকিতেন। ইহাতে যুদ্ধ উপস্থিত হইলেও বিমুখ হইতেন না। তিনি সর্ব্বদা যুদ্ধবেশে থাকিতেন। সুকঠিন বর্ম্ম তাঁহার দেহ রক্ষা করিত, সুতীক্ষ্ণ তরবারি ও বড়শা তাঁহার হস্তে শোভা পাইত। কিরূপে প্রকৃত যোদ্ধার ন্যায়

বীরত্বপ্রদর্শন করা যায়, ইহাই তাঁহার ভাবনার বিষয় ছিল। প্রকৃত যুদ্ধবীর হওয়া তিনি ধর্ম্মসম্মত কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করিতেন। আরাধ্য দেবতার নিকট স্বাস্থ্য, আত্মরক্ষা ও সর্ব্বপ্রকার সুবিধা-জনক আবাস-গৃহ প্রভৃতি তাঁহার প্রার্থনার বিষয় ছিল। তিনি যত্নপূর্ব্বক, যুদ্ধ-বিদ্যা অভ্যাস করিতেন। যুদ্ধে বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সংগ্রহে তাঁহার সন্তানগণ সর্ব্বদা তাঁহার সহায়তা করিত। তিনি ইহলোকে সন্তুষ্ট ও পরলোকে সন্তৃপ্ত হইবার জন্য দেবতাদের নিকট সুস্থ ও বলিষ্ঠ সন্তান প্রার্থনা করিতেন। পরিবারপ্রতি-পালন ব্যতীত অধিকৃত জনপদের শান্তিরক্ষণেও তাঁহার মনোযোগ ছিল। তদীয় ধর্ম্মপত্নী আরাধনাস্থলে বা উৎসব-ভূমিতে তাঁহার সহিত উপস্থিত হইতেন। পুরোহিতেরা তাঁহার দানশীলতার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন। কেহ কোন মহৎ-কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলে সকলেই তাহাকে উৎসাহিত করিত। এইরূপে আর্য্যদিগের সাহস ও পরাক্রম ক্রমেই বর্দ্ধিত হইত। ক্রমেই তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বী দাসদিগকে পরাজিত করিয়া আপনাদের অধিকারবৃদ্ধি করিতে অগ্রসর হইতেন। আর্য্যগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণে বিভক্ত ছিলেন। চতুর্থ বর্ণের নাম শূদ্র। বোধ হয়, পরাজিত দাসেরা এই চতুর্থ শ্রেণীতে নিবেশিত হইয়া-ছিল। ধর্ম্মসংগত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান, শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাদান প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্যের ভার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রাহ্মণের প্রতি সম-র্পিত ছিল। ক্ষত্রিয় রাজ্যশাসন ও শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিতেন। তাঁহাকে আর্ত্ত ব্যক্তির পরিত্রাণের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইত। বৈশ্য গবাদি জীবের পালন ও কৃষি-কার্য্যের সম্পাদন করিত। আর্য্যদের শুশ্রূষাকরা চতুর্থ বর্ণ শূদ্রের প্রধান কার্য্য ছিল।

রামায়ণ ও মহাভারত।

রামায়ণ বাল্মীকির এবং মহাভারত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের প্রণীত। এই দুই মহাগ্রন্থকে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের ইতিহাসও বলা যাইতে পারে।

রামরাবণের যুদ্ধ রামায়ণের এবং কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ মহাভারতের প্রধান ঘটনা। অযোধ্যার অধিপতি মহারাজ দশরথের তনয় রামচন্দ্র বিমাতা কৈকেয়ীর মন্ত্রণায় চৌদ্দ বৎসরের জন্য অরণ্যে নির্ব্বাসিত হন। নির্ব্বাসিত হইয়া, রামচন্দ্র প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও প্রিয়তমা ভার্য্যা সীতার সহিত দক্ষিণাপথে যাইয়া দণ্ডকারণ্যে বাস করেন। এই আরণ্য ভূমি লঙ্কার অধিপতি রাবণের অধিকৃত ছিল। এই স্থান হইতে রাবণ সীতারে হরণ করিয়া লইয়া গেলে রামচন্দ্র লঙ্কায় যাইয়া রাবণকে প্রায় সবংশে বধ করিয়া, ভার্য্যার উদ্ধারসাধন করেন। রামের প্রতিদ্বন্দ্বিগণ অনার্য্য জাতি। রামায়ণকার ইহাদিগকে রাক্ষস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

রামায়ণের রামরাবণের যুদ্ধ যেমন আর্য্য ও অনার্য্যদিগের মধ্যে ঘটিয়াছিল, মহাভারতের কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ তেমন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সঙ্ঘটিত হয় নাই। দুর্য্যোধন দুর্ম্মতি-প্রযুক্ত যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতাকে রাজ্য দিতে অসম্মত হওয়াতে এই মহাযুদ্ধ উপস্থিত হয়। সুতরাং কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ আত্মীয়-দিগের মধ্যে আত্মবিগ্রহ। সচরাচর আত্মবিগ্রহের পরিণাম যেমন বিষময় হইয়া উঠে, এ যুদ্ধের পরিণামও তেমনি বিষময় হইয়াছিল। যুধিষ্ঠির যুদ্ধে জয়ী হইলেও রাজ্যভোগ করেন নাই। জ্ঞাতিগণের নিধনে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, এজন্য তিনি অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যভার দিয়া পঞ্চ ভ্রাতা ও প্রিয়তমা ভার্য্যার সহিত হিমালয় পর্ব্বতে প্রস্থান করেন।

রামায়ণ ও মহাভারতপাঠে প্রগাঢ় নীতিজ্ঞানলাভ হয়। মহারাজ দশরথের পুত্রবাৎসল্য, রামচন্দ্রের মাতাপিতৃভক্তি, ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের ভ্রাতৃবাৎসল্য, সীতার পতিভক্তি, সুগ্রীবপ্রভৃতির সুহৃৎপ্রণয়, হনূমানের প্রভুপরায়ণতা জগতে অতুল্য। আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকির মাধুর্য্যময়ী লেখনীর গুণে এই সকল বিষয় রামায়ণে মধুরভাবে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। জীবলোককে অতুলনীয় ধর্ম্মভাব ও অনবদ্য নীতির উপদেশ দিবার জন্যই যেন, রামায়ণের মহামনা, মহাপুরুষগণ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র, রাজ্যসুখে উপেক্ষা করিয়া, পিতৃসত্যরক্ষার জন্য অকাতরে কঠোর বনবাসক্লেশ সহিয়াছিলেন। এই বনবাসের নিদানভূতা কৈকেয়ীর প্রতি তিনি এক দিনের জন্যও অসম্মানপ্রদর্শন করেন নাই। লক্ষ্মণ কেবল ভ্রাতৃসেবার জন্য রামের সহিত বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ভরত রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াও, রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন নাই। তিনি সহোদরের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন জন্য তাঁহার পাদুকাকেই রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বরূপ রাজসিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছিলেন।

সীতা চিরদুঃখিনী ছিলেন। তিনি সুখে সংবর্দ্ধিতা ও সৌভাগ্যে লালিতা হইয়াও কাননচারিণী, পতি ও দেবরকর্ত্তৃক পরিরক্ষিতা হইয়াও পরাপহৃতা ও পরলাঞ্ছিতা, শেষে পতিসহ অযোধ্যার অধীশ্বরী হইয়াও মহর্ষির শান্তরসাস্পদ আশ্রমপদের অধিবাসিনী ব্রহ্মচারিণী। তিনি সর্ব্বগুণের অধিকারী, সর্ব্বসম্পত্তির অধিপতি পতিলাভ করিয়াও, চিরকাল কঠোর কষ্টে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। এরূপ কঠোরতাতেও তাঁহার সহিষ্ণুতা বিচলিত হয় নাই। পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলেও সর্ব্বদেবময় পতির প্রতি তাঁহার ভক্তির অণুমাত্র হ্রাস হয় নাই। সীতা পতিব্রতার আদর্শস্থানীয়া। চিরদুঃখিনী সীতার চরিত্র, চিরকষ্টময় সংসারে চিরপবিত্র অমৃতপ্রবাহ।

মহাভারতপাঠেও নানাবিষয়ে উপদেশলাভ হয়। ভীষ্মের অটল প্রতিজ্ঞা, যুধিষ্ঠিরাদির ধর্ম্মভাব, দ্রৌপদীর গৃহকার্য্যকুশলতা প্রভৃতির বিবরণ সর্ব্বাংশে উপদেশপ্রদ। মহাভারতে ভীষ্মের চরিত্র অতি অপূর্ব্ব। ভীষ্ম প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্য বিস্তৃত রাজ্য, অপরিমিত ধন, অতুল রাজসম্মান, সমুদয়েই উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মশীলতা, নিঃস্পৃহতা, জিতেন্দ্রিয়তা ও সত্যপ্রতিজ্ঞতা অতুল্য। তিনি পরমারাধ্য জনকের সন্তোষসাধন জন্য স্বার্থত্যাগী হইয়া, অসাধারণ ধর্ম্মশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া, অপূর্ব্ব নিঃস্পৃহতাপ্রদর্শন করিয়াছেন, কখনও দারপরিগ্রহ না করিয়া জিতেন্দ্রিয়তার একশেষ দেখাইয়াছেন এবং অম্লানভাবে কঠোর প্রতিজ্ঞার পালন করিয়া, অদ্ভুত সত্যপ্রতিজ্ঞতার সম্মানরক্ষা করিয়াছেন। একাধারে এরূপ অসাধারণ গুণসমূহের সমাবেশ প্রায় দেখা যায় না। বস্তুতঃ রামায়ণ ওমহাভারত সর্ব্বনীতিতে পরিপূর্ণ। নীতিজ্ঞানলাভ করিতে হইলে এই দুই মহাগ্রন্থ মনোযোগসহকারে পাঠ করা কর্ত্তব্য।

রামায়ণের সময়ে ভারতবর্ষের সকল স্থানে হিন্দুদিগের বসতি বিস্তৃত হয় নাই। আর্য্যাবর্ত্তে ও দক্ষিণাপথের কোন কোন স্থানে তাঁহারা বসতিস্থাপন করিয়াছিলেন। দক্ষিণাপথে দ্রাবিড়ীয় নামক অনার্য্য জাতির সংখ্যাই অধিক ছিল। রামায়ণের পর মহাভারতের সময়ে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে হিন্দুদিগের বসতি বিস্তৃত হয়। কান্যকুব্জে দ্রুপদবংশীয়গণ, বিহারে জরাসন্ধ, মথুরার পশ্চিমে, বর্ত্তমান জয়পুরের উত্তরে বিরাট, ভাগলপুরে কর্ণ, অগ্রে মথুরায়, পরে দ্বারকায় যদুবংশীয়গণ এবং পূর্ব্বপঞ্জাবে মদ্র প্রভৃতি মহারথ আর্য্যগণ আধিপত্যবিস্তার করিয়াছিলেন। সুতরাং যখন কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন পঞ্জাবের পার্ব্বত্য প্রদেশে,

বিহারের শ্যামল ক্ষেত্রে, বোম্বাইর সমৃদ্ধ স্থলে হিন্দুগণ বসতি-স্থাপন করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারতের সময়ে, কোশল (অযোধ্যা), বিদেহ (মিথিলা), কাশী (বারাণসী প্রদেশ), কুরু (দিল্লীপ্রদেশ) ও পঞ্চাল (কান্যকুব্জপ্রদেশ), এই কয়েকটি রাজ্য সবিশেষ পরাক্রান্ত ছিল।

রাজারা প্রাচীরবেষ্টিত রাজধানীতে থাকিয়া যথানিয়মে রাজ্যশাসন করিতেন। প্রজাপালন, করসংগ্রহ ও দেশরক্ষা ভিন্ন তাঁহাদের আর কোন গুরুতর কার্য্য ছিল না। তাঁহারা সময়ে সময়ে মৃগয়ায় যাইতেন। তাঁহাদের অনেকে দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত ছিলেন। প্রজারা সুখে কালাতিপাত করিত। রাস্তা ঘাট সকল পরিচ্ছন্ন ছিল। নগরের রাস্তায় জল দিবার জন্য লোক সকল নিয়োজিত থাকিত। ব্রাহ্মণের ক্ষমতা ও প্রাধান্য অপ্রতিহত ছিল। শূদ্রের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছিল। অসবর্ণবিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ স্বশ্রেণীর কন্যা ভিন্ন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কন্যাগ্রহণ করিতেন, ক্ষত্রিয় এইরূপ স্বশ্রেণীর কন্যা ভিন্ন, বৈশ্য ও শূদ্রের, এবং বৈশ্য স্বশ্রেণীর ভিন্ন শূদ্রের কন্যাপরিগ্রহ করিত। শূদ্রগণ কেবল স্বজাতীয়া কন্যার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইত। এই অসবর্ণ বিবাহে যে সকল লোকের উৎপত্তি হয়, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়া উঠে। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার বাণিজ্য ও বিলাস-দ্রব্যের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কৃষিকার্য্যের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছিল। হিন্দুকুশের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে স্বর্ণখচিত শাল ও বন্য বিড়াল প্রভৃতির কোমল চর্ম্ম, গুজরাটে কম্বল, কর্ণাট ও মহীশূরে মসলিন, বাঙ্গালায় হাতীর গদির চাদর প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। এতদ্ব্যতীত চীন প্রভৃতি দেশ

হইতে পশমী ও রেশমী কাপড় আসিত। রাজসূয় যজ্ঞে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে উপহার দিবার জন্য, এই সকল দেশের রাজারা, আপন আপন দেশের দ্রব্য সঙ্গে আনিয়াছিলেন। ক্ষেত্রের চারি দিকে খাল থাকিত, কৃষিজীবীরা এই খালের জল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সেচন করিত।

এই সময়ে নিম্নশ্রেণীর লোকের অবস্থা অনেকাংশে উন্নত হইয়াছিল। পূর্ব্বে শূদ্রগণ কেবল দাসত্বে নিযুক্ত থাকিত। কৃষিক্ষেত্রের ও বাড়ীর কার্য্য ব্যতীত ইহাদের উপর আর কোন গুরুতর ভার সমর্পিত হইত না। কিন্তু সময়ে এই অবস্থার পরিবর্ত্ত হয়। সময়ে শূদ্রেরা আর্য্যদের সহিত মিশিয়া আপনাদের প্রাধান্য দেখাইতে থাকে। রামায়ণ ও মহাভারতে নিম্নশ্রেণীর লোকের উৎকর্ষের অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। বস্তুতঃ এই সময়ে ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস ঐ শ্রেণীর উৎকর্ষ প্রাপ্তির জন্য অবিচ্ছিন্ন চেষ্টার বিবরণে পূর্ণ রহিয়াছে। তাহাদের এই চেষ্টা বিফল হয় নাই। তাহারা সরলতা ও সৎকার্য্যে আর্য্যদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া আপনাদের অবস্থার উন্নতিসাধন করে। অনেকে বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয়; অনেকে কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে থাকে। শেষে শূদ্রগণ "বৃষল" অর্থাৎ কৃষক নামে অভিহিত হয়। কালে এই বৃষলগণ প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষে আপনাদের আধিপত্যবিস্তার করিয়াছিলেন।

আর্য্যগণও শূদ্রদিগের উৎকর্ষপ্রাপ্তির উপায়বিধানে উদাসীন থাকেন নাই। আর্য্যসমাজে যথোচিত উদারতা ছিল। এই উদারতাগুণে আর্য্যসমাজ সচ্চরিত্র, সদাশয় ও সৎকর্ম্মশীল শূদ্রকেও আপনাদের শ্রেণীতে নিবেশিত করিতেন। বস্তুতঃ সাধুতার উপর আর্য্যদিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। ব্রাহ্মণ সাধুতা হইতে স্খলিত হইলে শূদ্রের শ্রেণীতে স্থান পাইতেন; শূদ্র সাধুতা দেখাইলে, ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত

হইত। মনু কহিয়াছেন, 'শূদ্র ব্রাহ্মণপদ প্রাপ্ত হন, ব্রাহ্মণও শূদ্রপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসন্তানের সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে।' প্রাচীন আর্য্যদিগের অন্যান্য গ্রন্থেও এ বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়। মহাভারতে লিখিত আছে, 'শূদ্র শুভ কর্ম্ম ও শুভ আচরণ করিলে ব্রাহ্মণ হন, বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের আচরণ করিলে ক্ষত্রিয় হইয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ অসচ্চরিত্র হন, তিনি ব্রাহ্মণত্বপরিত্যাগ পূর্ব্বক শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে শূদ্রসন্তান জিতেন্দ্রিয় ও শুদ্ধচিত্ত, তিনি ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজনীয়। উত্তমকূলে জন্ম, সংস্কার, বেদপাঠ ও উত্তমের সন্তান হইলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র, সেই ব্রাহ্মণ। চরিত্রদ্বারা সকলে ব্রাহ্মণ হয়। অতএব শূদ্র সচ্চরিত্র হইলে ব্রাহ্মণত্ব পাইয়া থাকে।' উদারহৃদয়, বিশুদ্ধমতি হিন্দুগণ উদারতা ও বিশুদ্ধতার দিকে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে। বিদুর দাসীপুত্র হইয়াও পাণ্ডবদিগের বরণীয় ছিলেন। লোমহর্ষণ সূতজাতীয় হইয়াও প্রাচীন আর্য্যসমাজের ঋষিদিগের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। ঋষিগণ ইঁহার পুত্র সৌতিকে মহাভারতবক্তার পদে নিযুক্ত করিতে সঙ্কুচিত হন নাই।

এই সময়ে ব্রাহ্মণের ক্ষমতা বিচলিত হয় নাই। ক্ষত্রিয়েরা রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করিলেও সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল। ব্রাহ্মণগণ ব্যবস্থাপ্রণয়ন করিতেন। তাঁহারা সন্ধিবিগ্রহের মন্ত্রণাদাতা ছিলেন, নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের পরামর্শদাতা ছিলেন এবং সমুদয় সাংসারিক কার্য্যের ব্যবস্থাপক ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ ক্ষমতাপন্ন হইলেও আপনাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেন নাই। তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত সভ্যতা পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ স্থানপরিগ্রহ করে, তাঁহাদের প্রণীত শাস্ত্র পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতিকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের মহিমায় গৌর-

বান্বিত করিয়া তুলে। অসীম ক্ষমতাপন্ন হইলেও ব্রাহ্মণঋষিরা বিষয়নিঃস্পৃহ ছিলেন। তাঁহারা লোকালয়ের নিকটে সামান্য পর্ণকুটীরে বাস করিতেন, এবং পরহিতসাধন জন্য শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রপ্রচারে ব্যাপৃত থাকিতেন। এইরূপ বিষয়নিঃস্পৃহ ও এই-রূপ স্বার্থত্যাগী হইয়া, ব্রাহ্মণ এক সময়ে জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোকে চারি দিক উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন।

অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু হইতে রাজ্যরক্ষার ভার, ক্ষত্রিয়ের উপর সমর্পিত ছিল। ক্ষত্রিয় অপ্রমত্ত হইয়া ব্রাহ্মণের পরামর্শ অনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও প্রজাপালন করিতেন। পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্যে, বৈশ্যগণ লিপ্ত ছিল। ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য ইহাদিগকে বিভিন্ন দেশের ভাষা আয়ত্ত রাখিতে হইত। শূদ্রদের অবস্থা যে উন্নত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। ইহারা এ সময়ে শিল্পকর্ম্ম ও কৃষিকার্য্য করিত।

রাজারা আত্মপ্রাধান্য দেখাইবার জন্য সময়ে সময়ে অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাভারতের একটি প্রধান ঘটনা। এই মহাযজ্ঞে সকলকেই যুধিষ্ঠিরের প্রাধান্যস্বীকার করিতে হইয়াছিল। যুধিষ্ঠির মহারাজা-ধিরাজ হইয়া, এই মহাযজ্ঞ পরিসমাপ্ত করিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তি এই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হন। যুধিষ্ঠির ইঁহাদের প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই আদরসহকারে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ, এই মহাযজ্ঞে আড়ম্বরের এক-শেষ হইয়াছিল।

হিন্দুদিগের ধর্ম্মনীতিও উচ্চভাবে পূর্ণ ছিল। হিন্দুগণ অহিংসা সত্যবচন, সর্ব্বজীবে দয়া, শম ও যথাশক্তি দান, এই কয়েকটি গৃহস্থদের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন। গৃহস্থের নিকটে

এই সংসার চিরপবিত্রতাময় ধর্ম্মাচরণের অপূর্ব্ব ক্ষেত্র ছিল। গৃহস্থ যত্নপূর্ব্বক বেদাদি-শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। শাস্ত্রবিহিত কার্য্যে তাঁহার নিষ্ঠা ছিল। বুদ্ধিবৃত্তির সহিত ক্রমে তাঁহার ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির বিকাশ হইত। তিনি স্বার্থে উপেক্ষা করিয়া, পরহিত-সাধনে যত্নশীল হইতেন। ভোগবিলাসে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইত না। সৌখীনতায় তাঁহার দেহ শিথিল ও অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িত না। নিরবচ্ছিন্ন আত্মসুখবর্দ্ধনে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না। ধর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থের এই পরোপকারব্রতের মহিমায় সংসার শান্তিনিকেতন হইয়া উঠিত। অনেককে অনেক সময়ে গৃহীর শরণাপন্ন হইতে হয়। অতিথিগণ গৃহস্থের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। গৃহস্থকর্তৃক পরিশ্রমে অক্ষম আত্মীয়স্বজন প্রতিপালিত হয়। প্রাচীন ঋষিগণ হিন্দুসমাজের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াও, গৃহস্থের নিকটে দানগ্রহণ করিতেন। সুতরাং পরের উপকারের উদ্দেশ্যেই গৃহস্থকে আত্মজীবনের উৎসর্গ করিতে হইত। আত্মসুখসাধন ও আত্মোদরপূরণ গৃহস্থের কর্ত্তব্য নহে। শ্যামলপত্রাবৃত ফলপুষ্প-সমাকীর্ণ মহাবৃক্ষ যেমন স্নিগ্ধ ছায়ায় পথশ্রান্ত পথিকের শ্রান্তি-বিনোদন করে, সুস্বাদ ফল দিয়া, ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধাশান্তি করিয়া থাকে, শাখাবাহুবিস্তার করিয়া, শত শত বিহঙ্গকে আশ্রয়দান করে, গৃহস্থও সেইরূপ গৃহাগত ভিক্ষার্থীকে দান করিয়া, জীব-সমূহকে অন্ন দিয়া, অতিথি ও আর্ত্তজনের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া, ভূলোকে স্বর্গীয় শোভাবিকাশ করিতেন। ধর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থগণ সর্ব্বক্ষণ সংযতচিত্ত থাকিতেন। তাঁহারা বাল্যকালে যে শিক্ষা লাভ করিতেন, তাহাতে তাঁহাদের কষ্টসহিষ্ণুতা, ভোগাভিলাষ-শূন্যতা এবং ভক্তিশ্রদ্ধাপ্রভৃতি কোমল বৃত্তির উন্মেষ হইত। যিনি বিদ্যাশিক্ষার সময়ে বিলাসসাগরে নিমগ্ন হয়েন, তিনি কখনও মানব জীবনের কর্ত্তব্যসাধনে সমর্থ হয়েন না। বিষয়বাসনার পঙ্কিল

প্রবাহে তাঁহার চিত্ত নিরন্তর কলুষিত হয়। তিনি এই বিশাল বিশ্বরাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব হইয়াও নানাপ্রকার নিন্দনীয় কার্য্যে আমোদলাভ করেন। ধর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থগণ এরূপ বিলাসী বা ভোগাভিলাষী ছিলেন না। তাঁহারা সর্ব্বদা সংযতচিত্তে ধর্ম্মসম্মত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন।

ফলতঃ, আর্য্যদিগের ধর্ম্মনীতি, সকল বিষয়েই উন্নত অবস্থার পরিচয় দিয়া থাকে। আর্য্যগণ সন্তোষ ও সহিষ্ণুতার সম্বন্ধে, সাধুতা ও মহত্ত্বের সম্বন্ধে, শিষ্টাচার ও সৌজন্যের সম্বন্ধে, তেজ ও ক্ষমার সম্বন্ধে, উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সম্বন্ধে এবং নারীধর্ম্ম ও আচারব্যবহার প্রভৃতির সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট নীতিসমূহ নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল নীতির উপদেশ এই, উপস্থিত সুখদুঃখ সমভাবে বহন করিবে, যাহার মন পরিতুষ্ট, সকল বিষয়ই তাহার নিকট সম্পত্তীভূত হয়। যে পরিমাণে কেহ উপকার করে, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাহার প্রত্যুপকার করিবে। যাহাদের অন্নভোজন ও যাহাদের আলয়ে বাস করিতে হয়, কখনও তাহাদের অনিষ্ট করিবে না। বশীভূত ও হস্তগত শত্রুর নিগ্রহে সমর্থ হইয়াও যিনি তাহার প্রতি দয়াপ্রকাশ করেন, তিনিই পুরুষ। যাঁহারা পরশ্রী দেখিয়া তাপিত হন না, প্রত্যুত অসূয়াশূন্য ও হৃষ্ট হইয়া, উহাতে আহ্লাদপ্রকাশ করেন তাঁহারা স্বর্গগামী হইয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি স্তবকারী ও নিন্দাকারী, উভয়কেই তুল্যরূপ দেখেন, সেই শান্তাত্মা ও জিতাত্মা মানবগণ স্বর্গলাভ করেন। পরের অত্যুক্তি সহ্য করিবে। কাহারও অবমাননা করিবে না। এই মানবদেহ ধারণ করিয়া, কাহারও সহিত শত্রুতা করিবে না। কেহ তোমার প্রতি ক্রোধপ্রকাশ করিলে তাহার প্রতি তুমি ক্রুদ্ধ হইবে না। বৃদ্ধ ব্যক্তি গৃহে আগত হইলে, অভিবাদন করিয়া, তাঁহাকে স্বয়ং আসনাদি দিবে। নিয়তই উদ্যত

থাকিবে, কোনও ক্রমে অবনত হইবে না। সমুৎপন্ন ক্রোধকে প্রজ্ঞাবলে বশীভূত করিবে, ক্ষমাপর ব্যক্তিরা ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে শ্রেয়ঃ লাভ করেন। কর্ম্ম করিয়া পুনঃ পুনঃ শ্রান্ত হইলেও কর্ম্ম আরম্ভ করিবে; পুরুষ অশক্ত বলিয়া কখনও আপনার অবমাননা করিবে না, যেহেতু, আত্মাবমানী ব্যক্তি কখনও ঐশ্বর্য্য-লাভ করিতে পারে না। ইহার পর নারীধর্ম্মসম্বন্ধে লিখিত আছে, স্ত্রী সর্ব্বদা প্রহৃষ্টা থাকিবে, গৃহকর্ম্মে দক্ষা হইবে, গৃহসামগ্রী সমূহ পরিষ্কৃত রাখিবে, ব্যয়বিষয়ে ধীর হইবে, পরিজনবর্গকে পরিতুষ্ট রাখিবে এবং সকলকে ভোজন করাইয়া শেষান্ন আপনি ভোজন করিবে। আচারব্যবহার ও অতিথিসৎকার প্রভৃতির সম্বন্ধেও হিন্দুদিগের উদারতা ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের উপদেশ এই, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, পত্নী, কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ ও ভৃত্যবর্গ, ইহাদের সহিত কখনও বিবাদ করিবে না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, ভার্য্যা ও পুত্র আপনার শরীরের ন্যায়, দাসবর্গ ছায়ার স্বরূপ, আর দুহিতা পরমকৃপার পাত্রী। মাতা-পিতাকে মৃদু বাক্য কহিবে, সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রিয় কার্য্য করিবে, এবং তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে। যেস্থানে স্ত্রীলোক আদৃত হন, সেস্থানে দেবতারা প্রসন্ন থাকেন, যেস্থানে নারীদিগের অনাদর, সেস্থানে সকল সৎকার্য্য নিষ্ফল হয়। ধর্ম্মসঙ্গত উপায়ে যে ধনলাভ হয়, তাহাকেই যথার্থ ধন বলে। কোন উৎকৃষ্ট দ্রব্য অতিথিকে না দিয়া আপনি ভোজন করিবে না, অতিথি-সেবাদ্বারা সর্ব্ববিষয়ে শ্রেয়োলাভ হয়। স্বাস্থ্য-রক্ষার সম্বন্ধেও হিন্দুদিগের সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁহারা কহিয়াছেন, অতিথিশালা-নির্ম্মাণ, মূত্রাদিত্যাগ, পাদপ্রক্ষালন ও উচ্ছিষ্ট দ্রব্য-নিক্ষেপ, এগুলি আবাস-গৃহ হইতে দূরে করিবে। জলে মূত্র, বিষ্ঠা বা নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিবে না, কিংবা রক্ত বা কোন প্রকার বিষ

ফেলিবে না। দেহরক্ষার জন্য পরিষ্কৃত জল সাতিশয় প্রয়োজনীয়। পানীয় জল অবিশুদ্ধ হইলে নানা রোগের উৎপত্তি হয়। আর্য্যগণ ইহা জানিতেন, এই জন্য তাঁহারা পানীয় জল বিশুদ্ধ রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন। অপরের গলগ্রহ হওয়া, কোন উপাদেয় দ্রব্য পরিজনবর্গকে না দিয়া একাকী ভোজন করাও হিন্দু আর্য্যেরা ঘোরতর পাপের মধ্যে গণনা করিতেন। একদা কোন মুনি আপনার মৃণালগুলি কোন এক ঘাটে রাখিয়া স্নান করিতেছিলেন, স্নানের পর উঠিয়া দেখিলেন, সমুদয় মৃণাল অপহৃত হইয়াছে। তখন সেই ঋষি সমভিব্যাহারী ঋষিদিগকে মৃণালের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে ঋষিগণ কঠিন শপথ করিয়া আপনাদের নির্দ্দোষত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন কহিলেন, যে আপনার মৃণাল লইয়াছে, সে উপাদেয় দ্রব্য একাকী ভোজন করুক। প্রাচীন হিন্দুগণ এইরূপ সরল ও উদার ছিলেন। এইরূপ সরলতা ও উদারতা তাঁহাদের ধর্ম্মনীতিতে পরিস্ফুট হইয়াছে। বোধ হয়, কোন দেশের সভ্য জাতি ধর্ম্মনীতির উচ্চতায় প্রাচীন হিন্দুদিগকে অতিক্রম করিতে পারে নাই।

রামায়ণ ও মহাভারতের সময়ে হিন্দু মহিলারা আদর ও সম্মানের পাত্রী ছিলেন। বাড়ীর কর্ত্তা বিশ্বস্তা কিঙ্করীদিগেরও কোনরূপ অসম্মান করিতেন না। যুধিষ্ঠির আপনার কিঙ্করীকে "ভদ্রে" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। পরস্পরের প্রতি কুশলপ্রশ্নজিজ্ঞাসার সময়ে, অগ্রে স্ত্রীলোকের বিষয় জিজ্ঞাসিত হইত। ভরত বন-প্রবাসী রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলে, রামচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান দেখাইয়া থাক ত?" ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ এক সময়ে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "রাজ্যের দুঃখিনী অঙ্গনারা ত উত্তমরূপ রক্ষিত হইতেছে? রাজবাটীর স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ত সম্মান প্রদর্শিত হয়?" যে স্ত্রীলোকের দ্রব্য

অপহরণ, কি বিবাহিতা বা অবিবাহিতা নারীর বিশুদ্ধ চরিত্রে দোষারোপ করিত, তাহার গুরুতর দণ্ড হইত। এই সময়ে নারীগণ স্বামীর সহিত যজ্ঞপ্রভৃতি উৎসবস্থলে উপস্থিত হইতেন। স্বয়ম্বর-প্রথা প্রচলিত ছিল। কেহ কোন অসামান্য কার্য্যে পারদর্শিতা-প্রকাশ করিলে কন্যার পিতা তাঁহার হস্তে কন্যারত্ন সমর্পণ করিতেন। রামচন্দ্র দুর্ভেদ্য হরধনুর্ভঙ্গ করিয়া, সীতার সহিত পরিণয়-পাশে আবদ্ধ হয়েন। অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদপূর্ব্বক দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করেন। কোন কোন স্থলে অসামান্য পরাক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক স্বয়ম্বরসভা হইতে কন্যাগ্রহণ করা হইত। রণকুশল ক্ষত্রিয়গণ এরূপ বীরত্বপ্রকাশ করা গৌরবকর বলিয়া মনে করিতেন। ভীষ্ম লোকাতীত ক্ষমতাপ্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দিবার জন্য কাশীরাজের কন্যাদিগকে আনিয়াছিলেন।

কোন কোন স্থলে সহমরণপ্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। মহাভারতে দৃষ্ট হয়, মহারাজ পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে, পতিপরায়ণা মাদ্রী তাঁহার সহগমন করিয়াছিলেন। সামান্য ভোগসুখপরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদেবময় পতির অনুগমন করিলে, লোকান্তরে পরমসুখে তাঁহার সহিত বাস করিতে পারিব, ইহা মনে করিয়া, সতী ভর্ত্তার চিতানলে প্রাণবিসর্জ্জন করিতেন। অনেকস্থলে ব্রহ্মচর্য্যও অনুষ্ঠিত হইত। নারীগণ অনেক সময়ে স্বামীর মৃত্যুর পর অনুমৃতা বা পুনর্ব্বার বিবাহপাশে আবদ্ধা না হইয়া, ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন।

যাহা হউক, হিন্দু মহিলাগণ যথানিয়মে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। আলেখ্যরচনা ও শিল্পকার্য্যে তাঁহাদের যথোচিত মনোযোগ ছিল। গৃহকার্য্যেও তাঁহাদের অমনোযোগ ছিল না। তাঁহারা মিত ব্যয় ও মিতাচার অভ্যাস করিতেন। তাঁহাদিগকে আয়ব্যয়সম্বন্ধীয় সকল কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে হইত। তাঁহারা গৃহপরিষ্কার, গৃহোপকরণ-মার্জ্জন ও পাক প্রভৃতি কার্য্যে দক্ষা হইতেন। মহাভারতে

লিখিত আছে, পতিপ্রাণা দ্রৌপদী এক সময় কথাপ্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন, "আমি অনন্যমনে পতিগণের চিত্তানুবর্ত্তন করি, প্রত্যহ উত্তমরূপে গৃহপরিষ্কার, গৃহোপকরণমার্জ্জন, পাক, যথাসময়ে ভোজ্য সামগ্রী দান ও সাবধানে ধান্যরক্ষা করিয়া থাকি, কখনও দুষ্টা স্ত্রীর সহিত সহবাস করি না, তিরস্কারবাক্য মুখেও আনি না। সকলের প্রতি অনুকুলতা দেখাই, আলস্যশূন্য হইয়া কালযাপন করি। কখন অতিহাস্য ও অপরিষ্কৃত স্থানে বাস করি না, এবং কখনও অতিক্রোধের বশীভূত হই না।" হিন্দু মহিলারা যে, সুগৃহিণীর ধর্ম্ম অবগত ছিলেন, তাহা মহাভারতের এই বর্ণনায় প্রকাশ পাইতেছে।

হিন্দুমহিলাগণ আদর ও সম্মানের পাত্রী হইয়া যথানিয়মে বিদ্যাশিক্ষা করিলেও সকল বিষয়ে স্বাধীনতালাভ করিতে পারিতেন না। তাঁহাদিগকে অপরের অধীনতা স্বীকার করিতে হইত। মনুর মতে বালিকাই হউক, যুবতীই হউক, আর বৃদ্ধাই হউক, স্ত্রীলোক কোন সময়ে কোন কর্ম্মে আপন ইচ্ছামত চলিতে পারিবে না। স্ত্রীলোক এই তিন অবস্থায় যথাক্রমে পিতা, ভর্ত্তা ও পুত্রের অধীন হইয়া চলিবে। কোন বিষয়ে স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য নাই। হিন্দুমহিলাগণ এইরূপ পরতন্ত্র হইয়া থাকিলেও আত্মোৎকর্ষবিধানে উদাসীন ছিলেন না। তাঁহাদের গুণে সাংসারিক বিষয় সুশৃঙ্খল থাকিত। তাঁহাদের করুণায় দীনহীনেরা শান্তিলাভ করিত। তাঁহাদের আবির্ভাবে গৃহস্থের গৃহ ধর্ম্মালোকে উদ্ভাসিত হইত। হিন্দুললনা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্ববিষয়ে পবিত্রভাবরক্ষা করিতেন।

চারি আশ্রম

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য, এই চারি আশ্রম প্রাচীন হিন্দু-সমাজে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন হিন্দুগণ কিরূপে আপনাদের পবিত্রতাময় সুদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করিতেন, সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ ত্যাগ করিয়া, সমাজের উপকারের জন্য আপনাদের জীবন কিরূপ কঠোর ব্রতময় করিয়া তুলিতেন, এবং আপনাদের ধর্ম্মে কিরূপ গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখাইতেন, তাহা এই চারি আশ্রমের বিষয় আলোচনা করিলে হৃদয়ঙ্গম হয়।

প্রথম আশ্রম, ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্য্য সকল আশ্রমের আদি। মানবের ধর্ম্মমন্দিরে আরোহণের প্রথম সোপান ব্রহ্মচর্য্য। বীজ, উপযুক্ত রস ও তাপের সাহায্যে যেমন ফলধারণক্ষম বৃক্ষের আকারে পরিণত হয়, হিন্দু বালক তেমন ব্রহ্মচর্য্যের সাহায্যে গভীর ধর্ম্মতত্ত্বের অধিকারী আর্য্য নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। বাল্যকালে হৃদয়ে যে ভাব প্রবেশ করে, বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমে তাহার বিকাশ হইতে থাকে। শৈশবের জ্ঞান, শৈশবের শিক্ষা, শৈশবের ধারণা চিরকাল হৃদয়ে অঙ্কিত থাকে। প্রস্তরে খোদিত রেখা যেরূপ সহজে বিলুপ্ত হয় না, শিশুকালের শিক্ষাও সেইরূপ সহজে হৃদয় হইতে অপসারিত হয় না। এই জন্য আর্য্যভূমিতে বাল্যকালেই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমপালনের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। যাহাতে পরম ধার্ম্মিক উপযুক্ত গৃহস্থ হওয়া যায়, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে প্রধানতঃ তাহারই শিক্ষা দেওয়া হইত। আর্য্যসন্তানের পঞ্চম অথবা অষ্টম বর্ষ হইতে ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ হইত। এই সময়ে তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষার্থ গৃহ হইতে গুরুসন্নিধানে গমন করিতে হইত। একটি বা সমগ্র বেদ কণ্ঠস্থ করাই তাঁহার শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। বেদের নাম ব্রাহ্মণ হওয়াতে তিনি ব্রহ্মচারী

অথবা বেদশিষ্য বলিয়া উক্ত হইতেন। শিক্ষালাভ করিতে ন্যূনকল্পে বার বৎসর ও ঊর্দ্ধসংখ্যায় আটচল্লিশ বৎসর অতিবাহিত হইত। গুরু-গৃহে বাসকালে কোমলমতি, তরুণবয়স্ক ছাত্রকে অতি কঠিন নিয়মাবলীর অধীন হইয়া চলিতে হইত। তিনি প্রতিদিন দুই বার, অর্থাৎ সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত সময়ে সন্ধ্যা করিতেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাঁহাকে ভিক্ষার্থ পল্লীতে পল্লীতে পরিভ্রমণ করিতে হইত। তিনি এই ভিক্ষালব্ধ সমস্ত দ্রব্যই গুরুর হস্তে দিতেন। গুরু যাহা খাইতে দিতেন, তদ্ভিন্ন তিনি আর কিছুই খাইতে পারিতেন না। তাঁহাকে জল আনয়ন, যজ্ঞের জন্য সমিধ্ আহরণ, হোমস্থান পরিষ্কার ও দিবারাত্রি গুরুর পরিচর্য্যা করিতে হইত। এই সকল কঠোর নিয়মানুষ্ঠানের বিনিময়ে গুরু তাঁহাকে বেদ শিক্ষা দিতেন। এই বেদ যাহাতে কণ্ঠস্থ হয়, এবং যাহাতে তিনি দ্বিতীয় আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া, উপযুক্ত গৃহস্থ হইতে পারেন, গুরু তাঁহাকে তদ্বিষয়ের উপযোগী শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিতেন না। বস্তুতঃ ব্রহ্মচারী বালককে মিতাহারী ও মিতাচারী হইয়া অতি কঠোর ব্রতপালন করিতে হইত। এ সম্বন্ধে মনুসংহিতায় অনেক-গুলি নিয়ম আছে। ব্রতচারী গুরু-কুলে বাস করিয়া, ইন্দ্রিয়সংযম করিবেন, সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা ও প্রাণিহিংসা পরিত্যাগ করি-বেন। তাঁহাকে কাম, ক্রোধ, লোভ, নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে হইবে। তিনি ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবন ধারণ করিবেন। তাঁহাকে দ্যূতক্রীড়া, পরনিন্দা, স্ত্রীসেবা ও পরের অপকার পরিত্যাগ করিতে হইবে। তিনি আচার্য্যের সমুদয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনিয়া দিবেন, প্রতিদিন স্নান করিবেন, শুচি হইয়া, দেব, ঋষি, পিতৃলোকের তর্পণ ও দেবার্চ্চনা করিবেন, এবং যজ্ঞকাষ্ঠ আনিয়া হোম করিবেন। এইরূপ কষ্টসহিষ্ণু, এই-রূপ আত্মসংযত ও এইরূপ ভোগবিলাস-পরিশূন্য হইয়া, তরুণ-

বয়স্ক ব্রহ্মচারী দশবিধ ধর্ম্ম লক্ষণ শিক্ষা করিতেন। দশপ্রকার ধর্ম্মলক্ষণ এই,—ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনঃসংযম, অচৌর্য্য, শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, শাস্ত্রজ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা, সত্য-কথন ও অক্রোধ। হিন্দু আর্য্যের পবিত্র ভূমিতে, পবিত্রস্বভাব শিক্ষার্থী, গভীর ধর্ম্মতত্ত্বে অভিজ্ঞতালাভের উদ্দেশ্যে, সমুদয় ভোগবিলাস হইতে দূরে থাকিয়া, এই দশবিধ ধর্ম্মলক্ষণ শিক্ষা করিতেন।

ব্রহ্মচারী দুই প্রকার,—উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক। যাঁহারা দীর্ঘ কাল গুরুগৃহে বাস করিয়া, যথানিয়মে দশবিধ ধর্ম্মলক্ষণশিক্ষা পূর্ব্বক বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, গৃহস্থ হইতেন, তাঁহাদের নাম উপকুর্ব্বাণ, আর যাঁহারা দারপরিগ্রহ না করিয়া, বিষয়ভোগে নিঃস্পৃহ হইয়া কেবল অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও ঈশ্বরের চিন্তাতেই নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলিয়া উক্ত হইতেন।

বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইলে স্বাস্থ্যের সাতিশয় প্রয়োজন। শরীর রুগ্ন হইলে কোনও কার্য্যে মানুষের প্রবৃত্তি থাকে না। এই জন্য প্রাচীন আর্য্যগণ স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। ব্রহ্মচারী প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিতেন, স্নান করিয়া শুচি হইয়া, যজ্ঞকাষ্ঠ আনিতেন, হোমস্থান পরিষ্কৃত করিতেন, যথানিয়মে গুরুর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। এইরূপ শ্রমসাধ্য কার্য্যে তাঁহার শরীর দৃঢ় ও সবল হইত। সে সময়ে শিক্ষার্থীর বিলাসিতা ছিল না। সৌখিনতা পরিহার করিয়া, পার্থিব বিষয়লালসা হইতে দূরে থাকিয়া, শিক্ষার্থী শারী-রিক পরিশ্রমের বলে সমুদয় কার্য্য করিতেন। সুতরাং জ্ঞান-বৃদ্ধির সহিত তাঁহার দৈহিক বলের বিকাশ হইত, স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে থাকিত। এতদ্ব্যতীত শিক্ষার্থীর যে যে গুণ থাকা উচিত, ব্রহ্মচারী তৎসমুদয়ে বাল্যকাল হইতেই অভ্যস্ত হইতে

থাকিতেন। তিনি কষ্টসহিষ্ণুতা অভ্যাস করিতেন, ভোগবিলাস হইতে দূরে থাকিতেন, চিত্তসংযমে পারদর্শী হইতেন, নিষ্ঠাবান্ হইয়া দেবারাধনা, অধ্যয়ন ও গুরুর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। ব্রহ্মচারী পঞ্চম বা অষ্টমবর্ষ হইতে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া, অনেক বিঘ্নবিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া, চিত্তসংযম অভ্যাস করিতেন। তাঁহার জীবন কঠোর তপস্যাময় ছিল। তিনি এই তপস্যার বলে পরে গৃহস্থ হইয়া সংযতভাবে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন, এই তপস্যার বলে পবিত্র মানব নামের যোগ্য হইয়া উঠিতেন, এই তপস্যার বলে কি বিষয়-ক্ষেত্রে, কি ধর্ম্মরাজ্যে, সর্ব্বত্রই সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইতেন। মহাভারতে উল্লেখ আছে, আয়োদধৌম্যনামক এক জন শিক্ষাগুরুর উপমন্যু নামে এক জন শিষ্য ছিল। উপমন্যু ভিক্ষালব্ধ অন্নে উদরপূর্ত্তি করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন। গুরু, শিষ্যের কঠোর কষ্টসহিষ্ণুতারপরীক্ষা করিবার জন্য উপমন্যুকে ভিক্ষান্নগ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন। উপমন্যু গুরুর আদেশে কিছু মাত্র দুঃখিত নাহইয়া, পয়স্বিনী গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া, বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। গুরু ইহা শুনিয়া, তাঁহাকে দুগ্ধপান করিতেও নিষেধ করিলেন। উপমন্যু, দুগ্ধপানসময়ে বৎসের মুখ দিয়া যে ফেন বাহির হইত, তাহাই খাইয়া গুরুর আদেশপালন করিতে লাগিলেন। গুরু অতঃপর তাঁহাকে উহা খাইতেও বারণ করিলেন। উপমন্যু তখন বৃক্ষপত্র খাইয়া ভক্তিভাবে গুরুর পরিচর্য্যা ও সংযতচিত্তে বেদাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কষ্টসহিষ্ণুতার কি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত! কঠোর ব্রতাচরণের কি জ্বলন্ত উদাহরণ! এই শিক্ষার বলেই হিন্দুগণ পবিত্র ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ করিয়া বরণীয় দেবতার ধ্যান করিতে করিতে স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতেন। এই শিক্ষার বলেই হিন্দুগণ সংসার-ক্ষেত্রে

থাকিয়া লোক-হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে সক্ষম হইতেন। এই শিক্ষার বলেই হিন্দুগণ সমুদয় মলিনতা, সমুদয় পঙ্কিলভাব ও সমুদয় সাংসারিক প্রলোভন পরিহার করিতেন। যাঁহার হৃদয় এই শিক্ষায় বলীয়ান্ হইত, তিনিই প্রকৃত আর্য্য, তিনিই প্রকৃত হিন্দু, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক ছিলেন।

দ্বিতীয় আশ্রম, গার্হস্থ্য। ব্রহ্মচারী যথানিয়মে বিবাহ করিয়া দ্বিতীয় অর্থাৎ গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে গৃহস্থ বা গৃহমেধী বলিয়া উক্ত হইতেন। গৃহস্থ কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম পালন করিয়া নিষ্ঠাবান্, আত্মসংযত, বিলাস-বিদ্বেষী ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছেন। সুতরাং সংসার তাঁহার নিকট চিরপবিত্রতাময় ধর্ম্মাচরণের অপূর্ব্ব ক্ষেত্র বলিয়া প্রতীত হইতেছে। এ সময়ে তিনি বৈদিক স্তোত্র কণ্ঠস্থ করিয়াছেন। অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতাগণের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে। ব্রাহ্মণ তাঁহার অধীত হইয়াছে। এই পবিত্র গ্রন্থের নিয়মানুসারে তিনি সমুদয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি কোন কোন উপনিষদও অভ্যাস করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, এই দ্বিতীয় আশ্রম তাঁহাকে ধীরে ধীরে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর তৃতীয় আশ্রমের উপযোগী করিয়া তুলিতেছে। গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইয়া নিম্নলিখিত পাঁচটি ব্রতের পালন করিতেন :—(১) বেদাধ্যয়ন ও বেদাধ্যাপন। (২) শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ। (৩) আরাধনাদি দ্বারা দেবলোকের তর্পণ। (৪) জীবের আহারদান। (৫) অতিথিসৎকার। অনেককে অনেক সময়ে গৃহীর শরণাপন্ন হইতে হয়। অতিথি, অভ্যাগত প্রভৃতি গৃহস্থের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। গৃহস্থকর্ত্তৃক পরিশ্রমাক্ষম অনেক আত্মীয় স্বজন প্রতিপালিত হয়। প্রাচীন ঋষিগণ আর্য্যসমাজের সর্ব্বময়

কর্ত্তা হইয়াও গৃহস্থের নিকট ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়া পরিতুষ্ট থাকিতেন। সুতরাং পরোপকারার্থেই গৃহস্থকে আত্মজীবন উৎসর্গ করিতে হইয়া থাকে। আত্ম-সুখসাধন ও আত্মোদরপূরণ গৃহস্থের কর্ত্তব্য নহে। ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর ব্রত গৃহস্থকে এই সকল কার্য্য-সম্পাদনের উপযোগী করিয়া তুলিত। দুশ্চর ব্রহ্মচর্য্যায় গৃহী এখন কষ্ট-সহিষ্ণু হইয়াছেন। ভোগবিলাস ও সৌখীন ভাব দূর হইয়াছে। তিনি নিষ্ঠাবান্ ও সংযতচিত্ত হইয়া, সমস্ত কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। সংসারের প্রলোভন তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিতেছে না, শোকদুঃখ তাঁহাকে কাতর করিতে সমর্থ হইতেছে না, পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সাহস পাইতেছে না। তিনি সংসারক্ষেত্রে—পাপ-তাপের রাজ্যে অটল গিরিবরের ন্যায় অচলভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, ফলকামনাশূন্য হইয়া ঈশ্বরের প্রীতিকর কার্য্য-সাধনে অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন, অতিথি অভ্যাগত ও আর্ত্তজনের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া ভূলোকে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শোভাবিকাশ করিতেছেন। দান গৃহস্থের নিত্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। কি শ্রাদ্ধ, কি ব্রত, কি দেবসেবা, কি শান্তিস্বস্ত্যয়ন, সমস্ত বিষয়েই গৃহস্থকে দান করিতে হইত। অন্যান্য আশ্রম গৃহস্থাশ্রমের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিত। ব্রহ্মচারী গৃহস্থের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন, বানপ্রস্থ ব্যক্তি গৃহীর প্রদত্ত দানে জীবনধারণ করিতেন, যতী গৃহস্থকে অবলম্বন করিয়া নিরুদ্বেগে ধর্ম্মাচরণে ব্যাপৃত থাকিতেন। গৃহী দানধর্ম্মের মহিমায় এইরূপে সকলের রক্ষাকর্ত্তা হইয়া, সংসারক্ষেত্র গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতেন। ধর্ম্মগ্রন্থে গৃহস্থের সম্বন্ধে এইরূপ অনুশাসন আছে,—"সর্ব্বদা অন্নদান করিবে, ক্ষমা দেখাইবে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিবিষ্ট থাকিবে, সর্ব্বদা সকলের প্রতি যথোচিত সমাদরপ্রদর্শন করিবে। রোগীকে শয্যা,

শ্রান্তকে আসন, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় ও ক্ষুধার্ত্তকে আহারীয় দিবে। মঙ্গলেচ্ছু, ধীমান্ ব্যক্তি দীন, দরিদ্র, অন্ধপ্রভৃতি কৃপাপাত্রদিগকে ঔষধ, পথ্য ও অন্নদান করিবেন। গৃহস্থাশ্রমের কি শান্তিময়, কি পবিত্রতাময় চিত্র! গৃহীর কি অপূর্ব্ব দেবভাব! প্রাচীন আর্য্য-সমাজে গৃহস্থ ব্রহ্মচর্য্যের পর এইরূপ দেবভাবে পূর্ণ হইয়া, নশ্বর জীবনে অবিনশ্বর কীর্ত্তিসঞ্চয় করিতেন।

গৃহস্থ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কেবল বিষয়-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে তাঁহার ধর্ম্মাচরণের পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতে পারে। তিনি বিষয়-সুখে প্রমত্ত থাকিয়া অনন্ত স্বর্গীয় সুখে জলাঞ্জলি দিতে পারেন; এই বিঘ্ন দূর করিবার জন্য তৃতীয় আশ্রম অর্থাৎ বান-প্রস্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যখন গৃহস্থের কেশ শ্বেত হইত, দেহের চর্ম্ম শিথিল হইয়া পড়িত, যখন তিনি পুত্রের পুত্র দেখিয়া সুখী হইতেন, তখন তিনি বুঝিতে পারিতেন, তাঁহার সংসারপরি-ত্যাগের সময় উপস্থিত হইয়াছে। তখন তিনি পুত্রগণকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়া ধর্ম্মাচরণের উদ্দেশ্যে বনে প্রবেশ করিতেন। এই সময়ে তাঁহাকে "বানপ্রস্থ" বলা যাইত। তাঁহার স্ত্রীও ইচ্ছা করিলে তাঁহার অনুগমন করিতেন। বানপ্রস্থ ব্যক্তি নির্ব্বিবাদে ঈশ্বর-চিন্তায় ব্যাপৃত হইতেন। তিনি কিছুকাল কোন কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। কিন্তু এই যজ্ঞানুষ্ঠান গৃহাশ্রমের অনুরূপ ছিল না। বানপ্রস্থকে মানসিক অনুষ্ঠান মাত্র করিতে হইত। তিনি যজ্ঞের সমস্ত অঙ্গই মনে মনে স্মরণ করিতেন। এইরূপ করিলেই তাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠানের সমস্ত ফললাভ হইত। কিছু দিন পরে এই অনুষ্ঠানও সমাপ্ত হইত। বানপ্রস্থ ব্যক্তি তখন নানাবিধ তপ করিতে আরম্ভ করিতেন। স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া বা পরলোকে পুরস্কারপ্রাপ্তির আশায় কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান অনাবশ্যক, বানপ্রস্থ ব্যক্তির এইরূপ ধারণা ক্রমে বল-

স্বতী হইয়া উঠিত। তিনি নিষ্কামভাবে, নির্ব্বিকারচিত্তে ধর্ম্মাচরণ করিতেন।

গৃহী গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া, দেবারাধনা করিয়াছেন, পবিত্র চিত্তে ধর্ম্মকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াছেন. ফলকামনা-শূন্য হইয়া আর্ত্ত-জনকে আশ্রয় দিয়াছেন। দেবভক্তির উচ্ছ্বাসে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে, দেবসেবায় তাঁহার মন সংযত হইয়াছে, দেবারাধনায় তাঁহার নিষ্ঠা বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। তিনি নানাবিধ যজ্ঞ ও শান্তিস্বস্ত্যয়ন করিয়া, চিত্তসংযম, অন্তরশুদ্ধি, ভক্তি, প্রীতি, ও শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়াছেন। এখন জীবনের শেষ অবস্থায় একমাত্র, অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে চিত্তসমর্পণে তাঁহার অধিকার জন্মিয়াছে। পবিত্র বেদান্ত এখন তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি এই গ্রন্থের সাহায্যে অনাদি, অনন্ত ঈশ্বরের ধ্যানে সংযত হইয়াছেন। তাঁহার চারি দিকে এখন ঈশ্বরের অপূর্ব্ব সৃষ্টি, নিসর্গের কমনীয় শোভা বিরাজ করিতেছে। ফল-পুষ্পযুক্তনানাবৃক্ষসমাকীর্ণ বিজন অরণ্যের সুন্দর দৃশ্যে তাঁহার হৃদয় সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে, পর্ব্বত-কন্দরের গম্ভীরভাবে তাঁহার অন্তঃকরণ গাম্ভীর্য্যে আনত হইয়াছে, স্বচ্ছ-সলিলা স্রোতস্বতী বা নির্ঝরিণীর কোমল শব্দে তাঁহার হৃদয় কোমলতর হইয়া উঠিয়াছে, তিনি প্রকৃতির এই রমণীয় রাজ্যে—ঈশ্বরের এই সৌন্দর্য্যভাণ্ডারে যোগাসনে সমাসীন হইয়া নীরবে, নিস্পন্দভাবে সেই যোগিকুলধ্যেয় পরাৎপরের পরমা শক্তির ধ্যানে নিবিষ্ট রহিয়াছেন।

যাহাতে ভোগ-লালসা দূর হয়, ব্রহ্মজ্ঞান বৃদ্ধির পায়, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যসাধনে অনুরাগ জন্মে, বানপ্রস্থ ব্যক্তি তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। এই বনবাস তাঁহার ইচ্ছাবিরুদ্ধ ছিল না। ইহা তাঁহার একটি পবিত্র কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। যাঁহারা

যথানিয়মে ছাত্র ও গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন নাই, তাঁহারা এই পবিত্র আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। মানব হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় রিপুর দমন জন্য প্রথমে দুই অবস্থায় শিক্ষালাভ অতি আবশ্যক। এই শিক্ষায় কৃতকার্য্য হইলে, গৃহী বানপ্রস্থ হইয়া, প্রগাঢ় ভক্তিযোগসহকারে ঈশ্বরচিন্তায় মনোনিবেশ করিতেন। মনু কহিয়াছেন, "বানপ্রস্থ ব্যক্তি সর্ব্বদা ধর্ম্মগ্রন্থের অধ্যয়নে রত থাকিবে, শীত ও আতপপ্রভৃতির প্রভাব সহ্য করিতে যত্নশীল হইবে, সকলের উপকার করিবে, মনঃসংযমরক্ষা করিবে, প্রত্যহ দান করিবে এবং সর্ব্বজীবের প্রতি দয়াপ্রদর্শন করিবে।" বানপ্রস্থ ব্যক্তি এইরূপে ভোগসুখে নিঃস্পৃহ হইয়া, নিসর্গরাজ্যের মনোহর স্থানে ঈশ্বর চিন্তা করিতেন। সেই পবিত্র শান্তিনিকেতনে, সেই বরণীয় দেবের ধ্যানেই তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত হইত।

ব্রহ্ম-নিষ্ঠ সাধকের এই শেষ অবস্থাই তাঁহার শেষ আশ্রম। এই আশ্রমের নাম ভৈক্ষ্য অথবা সন্ন্যাসাশ্রম। সন্ন্যাসী সংসারের অনিত্যতা চিন্তা করিয়া, বৈরাগ্য অভ্যাস করিতেন। তিনি তখন কর্ম্ম-ফল কামনা করিতেন না, স্বকৃতকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ স্বর্গসুখও ইচ্ছা করিতেন না। নির্ব্বিকারচিত্তে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেই তাঁহার আগ্রহ হইত। তিনি নিঃসঙ্গ হইয়া, ব্রহ্মে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক মোক্ষ প্রাপ্ত হইতেন।

প্রাচীন আর্য্য-সমাজের এই আশ্রমচতুষ্টয় পরস্পরের সহিত কেমন সুন্দর শৃঙ্খলাবদ্ধ! যেমন সোপানের পর সোপান অতিক্রম না করিলে মন্দিরে উপনীত হইতে পারা যায় না, সেইরূপ এই আশ্রমচতুষ্টয়ের একটির পর একটি অতিক্রম না করিলে, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করা যায় না। ধর্ম্ম-মন্দিরের উচ্চতম প্রদেশে—ব্রহ্মজ্ঞানের শেষ সীমায় উপনীত হইতে হইলে, ব্রহ্মচর্য্যের

কঠোর ব্রতপালন করিয়া শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা সংগ্রহ করিতে হইবে, গৃহস্থ হইয়া, দেবারাধনা প্রভৃতি দ্বারা শ্রদ্ধা ভক্তি ও মনঃসংযম উপার্জ্জন করিতে হইবে, অরণ্যবাস স্বীকার করিয়া ঈশ্বরের ধ্যানে অভিনিবিষ্ট হইতে হইবে, শেষে এই শেষ আশ্রমে প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মিবে।

প্রাচীন হিন্দু-সমাজে জীবনের শেষ অবস্থায় এইরূপে সন্ন্যাসী হইয়া, ধর্ম্মাচরণ করিবার নিয়ম ছিল বটে, কিন্তু অরণ্যে বাস করিলে বা সন্ন্যাসী হইলেই যে, প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া যায় না, ইহা আর্য্যগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, বনে বাস করিলেও লোকের মন ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় চঞ্চল হইতে পারে। তাঁহাদের বোধ ছিল যে, সমাজের জনতা ও গোল-যোগের মধ্যেও মানব-হৃদয়ে পবিত্র আরণ্য আশ্রম থাকিতে পারে। সেই আশ্রমে মানব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। এজন্য নিষ্ঠাবান্, আত্মসংযত হিন্দু কখন কখন গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও যোগাভ্যাস করিতেন। রাজর্ষি জনক গৃহস্থ হইয়াও পরমাত্মনিষ্ঠ যোগী বলিয়া সাধারণের নিকট সম্মানিত হইয়াছিলেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন, "বানপ্রস্থ হইলেই ধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্মের প্রকৃত চর্চ্চা করিলেই কেবল ধর্ম্মলাভ হয়।" মনুসংহিতাতেও ঠিক এই ভাব দেখা যায়। মহাভারতে উল্লেখও আছে,—সংযমী লোকের অরণ্যবাসের প্রয়োজন কি, এবং অসংযমীরই বা অরণ্যের আবশ্যকতা কি? সংযমী যেখানে থাকেন, সেই স্থানই অরণ্য, সেই স্থানই আশ্রম।

"মুনি যদি পরিচ্ছদে ও অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া গৃহে বাস করেন, আর চিরদিন যদি শুদ্ধাচারী ও দয়াশীল থাকেন, তাহা হইলেই তিনি সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হন।

"আত্মা পবিত্র না হইলে দণ্ডধারণ, মৌনাবলম্বন, জটাভার-

বহন, মস্তক মুণ্ডন, বল্কল ও অজিন-পরিধান, ব্রত-পালন, অভিষেচন, যজ্ঞ, বনে বাস, ও শরীর-শোষণ, সমস্তই নিষ্ফল।"

আর্য্যগণ উল্লিখিত চারি আশ্রমের নিয়মসম্বন্ধে এইরূপ উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন চিত্তশুদ্ধ হইলে গৃহে থাকিয়াও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারা যায়। কিন্তু গৃহে থাকিলে পাছে কোনরূপ সাংসারিক প্রলোভনে পড়িতে হয়, পাছে তাঁহাদের চিত্তসংযমের কোন ব্যাঘাত জন্মে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা শেষজীবনে ইচ্ছাপূর্ব্বক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, অরণ্যে যাইয়া, ঈশ্বরচিন্তা করিতেন।

বুদ্ধের জীবনী।

শাক্য সিংহ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। প্রাচীন অযোধ্যা রাজ্যে ক্ষত্রিয়-বংশের এক শাখা শাক্য নামে প্রসিদ্ধ ছিল। প্রবাদ আছে, ইক্ষ্বাকু বংশের এক ব্যক্তি পিতৃ-শাপে গৌতমবংশীয় কপিলের আশ্রমে যাইয়া এক শাক (সেগুন) বৃক্ষের নীচে বাস করিয়াছিলেন। শাকবৃক্ষ ও আশ্রয়-দাতা কপিলের বংশের নাম অনুসারে এই বংশের নাম শাক্য ও গৌতম হয়। এই শাক্যকুলে ও গৌতমবংশে শাক্যসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। শাক্যসিংহের পিতার নাম শুদ্ধোদন, মাতার নাম মায়াদেবী। শুদ্ধোদন বারাণসীর প্রায় একশত মাইল উত্তরে মধ্যদেশেব উত্তরপূর্ব্বখণ্ডের রাজা ছিলেন। বর্ত্তমান গোরক্ষপুর জেলার অন্তঃপাতী কপিলবস্তু নামক নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। কপিলবস্তুর লুম্বিনী নামক উদ্যানে শাক্যসিংহের জন্ম হয়। কেহ কেহ কহেন, এখনকার গোরক্ষপুর জেলার নগরখাসনামক পল্লী শুদ্ধোদনের রাজধানী প্রাচীন কপিলবস্তু।

শাক্যসিংহের এক নাম সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থ শব্দের অর্থ,

যাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। শাক্য-কুলে ও গৌতম-বংশে জন্ম হওয়াতে তিনি শাক্যসিংহ ও গৌতম নামেও প্রসিদ্ধ হন। শাক্যসিংহের অর্থ, শাক্যবংশের শ্রেষ্ঠ। শাক্যসিংহ যখন সংসার পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার নাম বুদ্ধ হয়। বুদ্ধ শব্দের অর্থ জ্ঞানী।

শাক্যসিংহের জন্মগ্রহণের সাত দিন পরে মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। এত অল্প বয়সে মাতৃবিয়োগ হইলেও শাক্যসিংহকে কোন কষ্টে পড়িতে হয় নাই। শুদ্ধোদন, তনয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার আর এক মহিষীর হস্তে সমর্পণ করেন। এই মহিষী শাক্য-সিংহের মাতার ভগিনী। শুদ্ধোদন মায়াদেবীর জীবদ্দশাতেই ইঁহাকে বিবাহ করেন।

শাক্যসিংহ দেখিতে বড় সুশ্রী ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিও বড় তীক্ষ্ণ ছিল। শুদ্ধোদন ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার রূপবান্ ও বুদ্ধিমান্ তনয় অতঃপর পবিত্র সূর্য্যবংশের অনুমোদিত যুদ্ধ-বিদ্যায় পার-দর্শী হইয়া যথানিয়মে রাজ্যশাসন করিবেন। কিন্তু তাহা হইল না। শাক্যসিংহ অন্য পথ অবলম্বন করিলেন। তিনি বাল্য-কালেই চিন্তাপরায়ণ হইয়া উঠেন, সর্ব্বদা নিকটবর্ত্তী উদ্যানে বসিয়া চিন্তা করিতেন। শুদ্ধোদন পুত্রকে চিন্তা হইতে বিরত করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি সাংসারিক বিষয়ে আসক্তি জন্মাইবার জন্য পুত্রের বিবাহ দিতে উদ্যত হইলেন। অবিলম্বে ইহার আয়োজন হইল। শাক্যসিংহ উনিশ বৎসর বয়সে দণ্ডপাণির কন্যা পরমসুন্দরী গোপা বা যশোধরার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। বিবাহের নয় বৎসর পরে তাঁহার একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। এই সন্তানের নাম রাহুল।

শাক্যসিংহ গৃহস্থ হইলেন বটে, কিন্তু চিন্তা হইতে বিরত

হইলেন না। তিনি শকটারোহণে প্রমোদ উদ্যানে যাইতে বৃদ্ধ ব্যক্তির শোচনীয় অবস্থা, মৃত ব্যক্তির শোচনীয় বিকার দেখিয়া পার্থিব সুখে বিতৃষ্ণ হইলেন। অবশেষে একটি ভিক্ষু তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ভিক্ষুর সৌম্য মূর্ত্তি, ভোগ-সুখে বিরক্তি ও ধর্ম্ম-চিন্তায় আসক্তি দেখিয়া, তিনি সুখী হইলেন। অতঃপর পার্থিব সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই ভিক্ষুর ন্যায় ধর্ম্মচিন্তা করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। প্রিয়তমরাহুল,প্রণয়িনী গোপা বা ভক্তিভাজন জনক জননীর মমতায় তিনি আর বিমুগ্ধ রহিলেন না। ঊনত্রিংশ বৎসরবয়সে, শাক্যসিংহ একদা গভীর নিশীথে পরিজনবর্গের অজ্ঞাতসারে গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্বারোহণে সমস্ত রাত্রি গমন করেন। সঙ্গে কেবল তাঁহার সেই বিশ্বস্ত শকট-চালক ছিল। শাক্যসিংহ এক স্থানে আসিয়া অশ্ব হইতে নামিলেন, এবং শকটচালককে আপনার পরিচ্ছদ ও সমস্ত অলঙ্কার দিয়া কপিলবস্তুতে পাঠাইয়া দিলেন। যেস্থানে শাক্যসিংহ তাঁহার অনুচরকে বিদায় দেন, সেই স্থানে একটি স্মরণস্তম্ভ ছিল। চীন দেশের বিখ্যাত ভ্রমণকারী হিউএনৃথ্ সঙ্গ কুশী নগরে যাইবার পথে একটি বৃহৎ অরণ্যের প্রান্তভাগে এই স্তম্ভ দেখিয়াছিলেন। কুশী নগর বর্ত্তমান গোরক্ষপুরের পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। ইহা এখন ভগ্ন দশায় পতিত রহিয়াছে। অধুনা এই স্থান কশিয়া নামে কথিত হইয়া থাকে।

শাক্যসিংহ প্রথমে বৈশালীতে (বিশার, গণ্ডক নদের পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী) এক জন ব্রাহ্মণের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। কিন্তু এ শিক্ষা তাঁহার মনোমত হইল না। ইহার পর তিনি বিহারের রাজধানী রাজগৃহে (আধুনিক রাজগিরি) আর এক জন ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের নিকট আসিলেন। এ ব্রাহ্মণও তাঁহাকে অভীষ্ট বিষয় শিক্ষা দিতে অসমর্থ হইলেন। শাক্যসিংহ এইরূপে বিফল-

মনোরথ হইয়া পাঁচ জন সহাধ্যায়ীর সহিত গয়া জেলার কোন পল্লীতে ধর্ম্মচিন্তায় ছয় বৎসর অতিবাহিত করেন। অনন্তর তিনি বুদ্ধগয়ায় পবিত্র বোধিবৃক্ষমূলে সমাধিগত হইয়া ইন্দ্রিয়-দমনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। এখন তাঁহার কামনা সিদ্ধ হইল। তিনি ছত্রিশ বৎসর বয়সে "বুদ্ধ" নাম পরিগ্রহ পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন।

বুদ্ধ প্রথমে বারাণসীতে ধর্ম্মপ্রচার করেন। তিনি দ্বিজের ন্যায় ছাত্রত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, দ্বিজের ন্যায় গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, দ্বিজের ন্যায় বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্মচিন্তায় তৎপর হইয়াছিলেন, শেষে দ্বিজের ন্যায় ভিক্ষুর বৃত্তি অবলম্বন করিলেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারে দ্বিজাতির রীতির অনুসরণ করিলেন না। ব্রাহ্মণেরা কেবল স্বশ্রেণীর লোককে পবিত্র ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন, বুদ্ধ শ্রেণীভেদ না করিয়া অকুতোভয়ে সকলের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। তিন মাসের মধ্যে তাঁহার ষাটি জন শিষ্য হইল। তিনি এই শিষ্যদিগকে ধর্ম্ম-প্রচারে নিযুক্ত করিলেন। এদিকে আর কতিপয় ব্যক্তিও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। বুদ্ধ এই শিষ্যদল লইয়া রাজগৃহে যাইয়া, রাজা অজাতশত্রু ও তাঁহার প্রায় সমস্ত প্রজাকে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। ইহার পূর্ব্বেই অজাতশত্রুর পিতা বিম্বিসার বৌদ্ধধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বুদ্ধ এইরূপে অযোধ্যা, বিহার ও উত্তর পশ্চিমপ্রদেশের স্থানে স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অযোধ্যা, বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী (রাপ্তী নদীর তীরবর্ত্তী বর্ত্তমান সাহেতমাহেত) তাঁহার প্রধান প্রচারস্থল ছিল। এজন্য এই কয়েক স্থান বৌদ্ধ-দিগের পরম পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া সম্মানিত হইয়া আসি-তেছে। বুদ্ধ বৎসরে আট মাস নানা স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন,

বর্ষার চারি মাস কোথাও যাইতেন না, প্রায়ই রাজগৃহের নিকটে থাকিয়া সকলকে উপদেশ দিতেন। এইরূপে সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া, বুদ্ধ জন্মভূমি কপিলবস্তুতে গমন করেন। শুদ্ধোদন যে পুত্রকে এক সময়ে অলঙ্কারভূষিত ও যৌবনশ্রীসম্পন্ন দেখিয়াছিলেন, এখন তাঁহাকে মুণ্ডিতমস্তক, পীতচীরধারী, ভিক্ষাভাজনহস্ত, ভ্রমণকারী ভিক্ষুর বেশে সমাগত দেখিলেন। এই প্রশান্ত দৃশ্যে—স্বার্থত্যাগের এই জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে বৃদ্ধ রাজার হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। তিনি ভক্তির সহিত পুত্রের উপদেশ গ্রহণ করিলেন, রাহুল ও গোপাও প্রফুল্লহৃদয়ে বৌদ্ধ হইলেন; ক্রমে শাক্যবংশের অনেকে আসিয়া তাঁহার পদানত হইল। বুদ্ধ আপনার জন্মভূমিতে আপনার কৃতকার্য্যতায় গৌরবান্বিত হইলেন।

চুয়াল্লিশ বৎসর, বুদ্ধ এইরূপে নানাস্থানে ধর্ম্মপ্রচার করেন। একদা তিনি শিষ্যগণের সহিত কুশীনগরে যাইতেছিলেন, পথে উদরাময় রোগে বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় তিনি একটি শাল বৃক্ষের নীচে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। এই বৃক্ষের নীচেই আশী বৎসর বয়সে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইল। কথিত আছে, খ্রীষ্টাব্দের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধ মানবলীলাসম্বরণ করেন।

সর্ব্বজীবে দয়া, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, সত্যনিষ্ঠা, জিতেন্দ্রিয়তা ও অহিংসা বৌদ্ধ ধর্ম্মের সার। বুদ্ধ জাতিভেদ স্বীকার করিতেন না, সমুদয় বর্ণের লোককেই আপনার ধর্ম্মে আনয়ন করিতেন। সকল শ্রেণীর লোকই বুদ্ধের ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া, বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক বা পুরোহিত হইতে পারেন। পুরোহিতকে মস্তক মুণ্ডন করিয়া যাবজ্জীবন অবিবাহিত থাকিতে হয়। ইঁহাদের সাধারণ নাম ভিক্ষু। ভিক্ষুর ধর্ম্মানুষ্ঠান বড় কষ্ট-সাধ্য। ভিক্ষু

শ্মশানভূমি হইতে সংগৃহীত চীর ব্যতীত অন্য কোন পরিচ্ছদ ধারণ করিতে পারিবেন না ; এই চীরখণ্ডগুলি তাঁহাকে নিজ হাতে সেলাই করিতে হইবে। তিনি চীর পরিচ্ছদের উপর হরিদ্রাবর্ণ একটি লম্বা অঙ্গচ্ছদ ধারণ করিবেন। তাঁহাকে অনাবৃত পদে দারুময় ভিক্ষা-ভাজন হস্তে করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপূর্ব্বক অতি সামান্যভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইবে। তিনি পূর্ব্বাহ্নে একবার মাত্র ভোজন করিবেন এবং নগর ও পল্লীগ্রাম হইতে দূরে থাকিবেন। অরণ্য তাঁহার আবাস-গ্রাম ও আরণ্য বৃক্ষের ছায়া তাঁহার আশ্রয়স্থল হইবে। তিনি ভিক্ষার জন্য নিকট-বর্ত্তী পল্লী বা নগরে যাইতে পারিবেন, কিন্তু রাত্রির পূর্ব্বেই তাঁহাকে আপনার বাসস্থান অরণ্যে আসিতে হইবে। তিনি কোন কোন রাত্রিতে সমাধিভূমিতে যাইয়া, সংসারের অপূর্ণতা ও অস্থায়িত্বের বিষয় চিন্তা করিতে পারিবেন। তাঁহার এইরূপ কঠোর ব্রতাচরণ, এইরূপ শীলতা, এইরূপ ধৈর্য্য, সাহস ও ধ্যানের একমাত্র উদ্দেশ্য অন্তিমে নির্ব্বাণপ্রাপ্তি। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ এক সময়ে এইরূপ বিষয়নিঃস্পৃহতা ও এইরূপ আত্মসংযমের পরিচয় দিতে ত্রুটি করেন নাই। এক সময়ে সাধু পুরুষগণ ইহার জন্য কঠোর তপস্যায় নিবিষ্ট হইয়াছেন, ইহার জন্য ধীরভাবে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, এবং ইহার জন্য সকল সম্প্রদায়কে ভাই বলিয়া আলি-ঙ্গন পূর্ব্বক আপনাদের সমদর্শিতার একশেষ দেখাইয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত বুদ্ধের মত তাঁহার শিষ্যগণের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পাঁচ শত শিষ্য গুরুর মৌখিক উপদেশ সকল গ্রন্থবদ্ধ করিবার জন্য রাজগৃহের নিকট সমবেত হন। শিষ্যগণ বুদ্ধের সমুদয় উপদেশ ও মত আবৃত্তি করিয়া তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত করেন। এই তিন অংশের বিষয় ধর্ম্মগ্রন্থের তিন ভাগে বিবৃত হয়।

রাজগৃহের এই সমিতি বৌদ্ধদিগের মধ্যে প্রথম সঙ্গীতি নামে প্রসিদ্ধ। সঙ্গীতির অর্থ, গান করা। বুদ্ধ স্বয়ং কোন ধর্ম্ম-গ্রন্থপ্রণয়ন করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় শিষ্যগণ একত্র হইয়া তাঁহার উপদেশ সকল আবৃত্তি করিয়াছিলেন, এই জন্য বোধ হয়, বৌদ্ধসমিতি "সঙ্গীতি" নামে অভিহিত হইয়াছে। এই সময়েও অজাতশত্রু বিহারে আধিপত্য করিতেছিলেন। ধর্ম্ম-প্রচারক কাশ্যপ এই সঙ্গীতিতে সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন। প্রথম সঙ্গীতিতে বুদ্ধের মত ও উপদেশ সকল তদীয় শিষ্যগণ কর্ত্তৃক যে তিনভাগে বিভক্ত হয়, তাহার প্রথমভাগ সূত্র, দ্বিতীয়ভাগ বিনয় ও তৃতীয়ভাগ অভিধর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। সূত্রে শিষ্য-গণের প্রতি বুদ্ধের উপদেশবাক্য, বিনয়ে বুদ্ধপ্রবর্ত্তিত বিধি ও অভিধর্ম্মে বুদ্ধের ধর্ম্ম-প্রণালীর বিবরণ আছে। এই সংগ্রহত্রয় ত্রিপিটক নামে অভিহিত হয়। কাশ্যপ সূত্রপিটকের, আনন্দ বিনয়-পিটকের ও উপালি অভিধর্ম্মপিটকের সংগ্রহকর্ত্তা।

ইহার এক শত বৎসর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধি-বেশন হয়। সাত শত বৌদ্ধ এই সঙ্গীতিতে উপস্থিত ছিলেন। এই এক শত বৎসরে বৌদ্ধদিগের মধ্যে অনেক বিষয়ে মত-বিরোধ জন্মে। এই বিভিন্নমতের সামঞ্জস্যবিধান জন্যই দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল।

সেকন্দর শাহের ভারতাক্রমণ।

মহাবীর সেকন্দর শাহ গ্রীশ দেশের অন্তঃপাতী মাকিদনের অধিপতি ছিলেন। পূর্ব্বে পারস্য দেশের অধিপতিগণ সাতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহারা সময়ে সময়ে গ্রীক রাজ্য আক্রমণ করি-তেন। বুদ্ধের জীবদ্দশায় অন্যতম পারসীক ভূপতি দরায়ুস্ হস্তাস্প-

একবার সিন্ধু নদ পার হইয়া ভারতবর্ষের কয়েকটি জনপদ অধিকার করেন। কালে পারশ্যরাজ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা হইলে সেকন্দর পারশ্য অধিকার করিয়া খ্রীষ্টাব্দের ৩২৭ বৎসর পুর্ব্বে ভারতবর্ষে উপনীত হন, এবং আটকের উজানে সিন্ধু নদ পার হইয়া বিনা যুদ্ধে, বিনা বাধায় তক্ষশিলা দিয়া, বিতস্তার নিকট আইসেন। এস্থলে বলা উচিত যে, তকনামক এক জাতি হইতে এই নগরের নাম "তক্ষশিলা" হয়। এই জাতি রাবলপিণ্ডীনিবাসী। এ সময়ে তক্ষশিলা সমৃদ্ধ ও জনপূর্ণ ছিল। যাহা হউক, সেকন্দর আসিয়া দেখিলেন, পঞ্জাব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। এই সকল খণ্ডরাজ্যের মধ্যে একতা নাই, রাজারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিযুক্ত, অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইয়া তাঁহার সাহায্যে উদ্যত। কিন্তু সেকন্দর প্রতিদ্বন্দ্বি-শূন্য হইলেন না। এই খণ্ড-রাজ্যের পুরুনামক এক জন রাজা ত্রিশ হাজার পদাতি, চারি হাজার অশ্বারোহী, তিন শত যুদ্ধরথ ও দুই শত হস্তী লইয়া সেকন্দরের বিরুদ্ধে বিতস্তার নিকট উপনীত হইলেন। শিখদিগের প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র চিলিয়ানবালার প্রায় চৌদ্দ ক্রোশ পশ্চিমে সেকন্দরের সহিত পুরুর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সেকন্দর বিজয়ী হন। কিন্তু তিনি বিজয়গৌরবে স্ফীত হইয়া বিজিতের প্রতি কোন রূপ অসম্মান দেখান নাই। সেকন্দর প্রতিদ্বন্দ্বীর অসাধারণ সাহস, পরাক্রম ও দেশ-হিতৈষিতাদর্শনে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। পুরু এইরূপে আপনার বিজেতার এক জন বিশ্বস্ত বন্ধু হইয়া উঠেন। সেকন্দর জয়লাভের স্মরণসূচক দুইটি নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। একটির নাম বুকফল। সেকন্দরের প্রিয়তম বাহন বুকফল যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, তাহার নামানুসারে এই নগরের নাম হয়। ইহা বিতস্তার পশ্চিম পারে বর্ত্তমান জলালপুরের নিকট অবস্থিত

ছিল। আর একটির নাম নিকেয়া, বিতস্তার পূর্ব্ব পারে। অধুনা এই স্থান মঙ্ নামে কথিত হইয়া থাকে।

ইহার পর সেকন্দর অমৃতসর দিয়া বিপাশার তটে উপনীত হন। শিখ ও ইঙ্গরেজদিগের যুদ্ধক্ষেত্র সোব্রাঁওর নিকট তাঁহার জয়-শ্রী সম্পন্ন সৈন্য আপনাদের জয়-পতাকা উড্ডীন করে। সেকন্দর পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া গঙ্গার তটে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ নিরতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এজন্য তাহারা অগ্রসর হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। সেকন্দর ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। প্রত্যাবর্ত্তনসময়ে তিনি দক্ষিণ পঞ্জাবে আলেক্‌জান্দ্রিয়ানামে একটি নগরস্থাপন করেন। আলেক্‌জান্দ্রিয়া, এখন উচ্ নামে প্রসিদ্ধ। সিন্ধু দেশের রাজধানী পাতালনামক নগরের পোতাধিষ্ঠানে তাঁহার জয়শ্রীযুক্ত পোত সকল ছিল। তিনি চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্নজাতীয় রণদুর্মদ লোকের দমন জন্য ঐ নগরে দুর্গের নির্ম্মাণ ও প্রধান সেনানিবাসস্থাপন করিয়াছিলেন। পাতাল এখন হয়দরাবাদনামে পরিচিত হইতেছে।

সেকন্দর পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে প্রায় দুই বৎসর অতিবাহিত করেন। ইহার মধ্যে তিনি কোন প্রদেশ আপনার অধীন করেন নাই। পরাজিত রাজাদের সহিত মিত্রতাস্থাপন, অভিনব নগরের প্রতিষ্ঠা তৎসমুদয়ে গ্রীক সৈন্যের সন্নিবেশ-কার্য্যেই, তিনি ব্যস্ত ছিলেন। আফগানিস্তানের সীমান্তভাগ হইতে বিপাশা পর্য্যন্ত, হিমালয়ের পাদদেশ হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত ভূভাগ তাঁহার বিজয়চিহ্নে অঙ্কিত ছিল। তিনি অনেক রাজ্য আপনার সাহায্যকারী সামন্তদিগকে দান করেন। উত্তর পঞ্জাবের তক্ষশিলা ও নিকেয়াতে, দক্ষিণ পঞ্জাবের আলেক্‌জান্দ্রিয়াতে গ্রীকদিগের অথবা বন্ধু রাজগণের সেনা-নিবাস প্রতি-

ষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত বাক্ত্রিয়াতে (বল্‌খ্‌) অনেকগুলি সৈন্য-অবস্থিতি করে। সেকন্দরের মৃত্যুর পর তদীয় সাম্রাজ্যবিভাগ-সময়ে সেলুকস্‌ নিকেতর নামক গ্রীক সেনাপতি বাক্ত্রিয়া ও ভারতবর্ষের অংশ প্রাপ্ত হন।

মগধ সাম্রাজ্য।

সেকন্দর সাহের সমকালে গঙ্গার তটে একটি অভিনব রাজশক্তি সমুত্থিত হয়। আপনার জন্য কোন রাজ্য লইবার অথবা আপনার কোন শত্রুকে নির্জ্জিত করিবার ইচ্ছা করিয়া, যে সকল সাহসী ও সমরপটু ভারতীয় বীর সেকন্দর সাহের শিবিরে উপস্থিত হন, তাঁহাদের মধ্যে চন্দ্রগুপ্তনামক এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধের সমকালে রাজগৃহ মগধের (বিহারের) রাজধানী ছিল। কিন্তু অজাতশত্রুরাজগৃহ ছাড়িয়া পাটলীপুত্র (পাটনা) নগর স্থাপন করেন। এই অবধি পাটলীপুত্র মগধের রাজধানী হয়। সেকন্দরের সমকালে নন্দবংশীয় শূদ্র রাজারা পাটলীপুত্রে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই বংশের একজন রাজার মুরা নামে একটি দাসী ছিল। চন্দ্র-গুপ্ত এই মুরার পুত্র। এজন্য তিনি মৌর্য্যবংশীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। চন্দ্রগুপ্ত পরিশ্রান্ত গ্রীকদিগকে গঙ্গার প্রসন্ন-সলিলবিধৌত, শস্য-সম্পত্তি-পূর্ণ শ্যামল ভূখণ্ডে আসিতে অনেক অনুরোধ করিয়া-ছিলেন, কিন্তু গ্রীকেরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে নাই। চন্দ্রগুপ্ত ইহাতে নিশ্চেষ্ট থাকিলেন না। আপনার বাহুবল ও চাণক্যের মন্ত্র-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া মগধ অধিকার করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। এই সময়ে বসুন্ধরা বীর-ভোগ্যা ছিল। এক জন সাহসে, বীরত্বে ও মন্ত্রশক্তিতে প্রবল হইলে, অপরের সিংহাসন অধিকার করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। চন্দ্রগুপ্ত ক্রমে

প্রবল হইয়া, আপনার অভীষ্ট কার্য্যসাধনে উদ্যত হইলেন। শূদ্রগণ আর্য্যধর্ম্মের অনুমোদিত আচারব্যবহারের পক্ষপাতী হইলেও ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের ন্যায় দ্বিজ বলিয়া পরিগৃহীত হয় নাই। তাহারা দ্বিজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে পরিগণিত হইলেও, উপস্থিত সময়ে শূদ্রগণ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। যাহারা এক সময়ে আর্য্যগণের শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিত, তাহারা সাধুতা ও সৎকর্ম্মশীলতায় আর্য্যদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ধর্ম্মনিষ্ঠ আর্য্যগণ তাহাদের সদাচারের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহারা সৎকর্ম্মশীল শূদ্রদিগকে উচ্চতর কার্য্যে নিয়োজিত করিতে থাকেন। সময়ে শূদ্রদিগের অধিকতর সৌভাগ্যের বিকাশ হয়; সময়ে শূদ্রগণ দ্বিজগণের সমক্ষে পরাক্রান্ত সম্রাট্ বলিয়া গৌরবান্বিত হন। শূদ্রবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত অবিলম্বে পাটলীপুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন, এবং নন্দবংশের ধ্বংসাবশেষে আপনার ক্ষমতার মহিমায় সকলের বরণীয় হইয়া উঠেন। এই চন্দ্রগুপ্ত মগধসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি সমুদয় উত্তর ভারতবর্ষ আপনার অধীন করিয়াছিলেন। পঞ্জাব হইতে তাম্রলিপ্তি (তমোলুক) পর্য্যন্ত তাহার জয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। পূর্ব্বতন রাজগণ পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণ অপেক্ষা ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইলেই আপনাকে "মহারাজচক্রবর্ত্তী" বলিয়া ঘোষণা করিতেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত আপনার বাহুবলে সমুদয় প্রদেশ অধিকার পূর্ব্বক এই গৌরব-সূচক উপাধি লাভ করেন। যে শূদ্রদিগকে আর্য্যেরা দাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, তাঁহারাই এখন ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় সম্রাট্ হইয়া উঠিলেন। বস্তুতঃ পৃথিবীতে যে সকল ব্যক্তি সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ইতিহাসে বরণীয় হইয়াছেন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের নাম তাঁহাদের শ্রেণীতে নিবেশিত হইবার যোগ্য। চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের আর

কোন রাজা সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ইতিহাসে সম্মানলাভ করিতে পারেন নাই।

সেলুকস খ্রীষ্টাব্দের ৩১২ হইতে ২৮০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সিরিয়ায় রাজত্ব করেন। চন্দ্রগুপ্ত খ্রীষ্টাব্দের ৩১৬ হইতে ২৯২ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, মগধসাম্রাজ্যশাসন করেন। সেকন্দরের মৃত্যুর পর সেলুকস যখন স্বীয় রাজ্যের শৃঙ্খলাবিধান করিতে ছিলেন, তখন চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাব পর্য্যন্ত আপনার অধিকার প্রসারিত করেন। এই উভয়ের রাজশক্তি যখন বদ্ধমূল হয়, তখন উভয়ে আত্মপ্রাধান্য দেখাইবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে উভয়ের সম্মুখীন হন। এ যুদ্ধে সেলুকসের পরাজয় হয়। পরাক্রান্ত সেকন্দর শাহ পুরুকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সেকন্দরের সেনাপতি পরাক্রান্ত সেলুকস, চন্দ্রগুপ্তের নিকট পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রিয়তম বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। চন্দ্রগুপ্ত অনুদারপ্রকৃতি ছিলেন না। তিনি এই বীরত্বলব্ধ বন্ধুতার গৌরবহরণ করিলেন না, সেলুকসকে আদরসহকারে গ্রহণ করিয়া পাঁচ শত হস্তী উপহার দিলেন। এদিকে সেলুকস পঞ্জাবস্থিত গ্রীক অধিকারের সহিত আপনার প্রিয়তমা দুহিতাকে চন্দ্রগুপ্তের হস্তে সমর্পণ করিলেন। চন্দ্রগুপ্তের সহিত গ্রীক কুমারীর বিবাহ হইল। সেলুকস জামাতার সভায় একজন দূত রাখিলেন। এই দূতের নাম মেগাস্থিনিস্। ইনি খ্রীষ্টাব্দের অনুমান ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে পাটলীপুত্রে ছিলেন।

মেগাস্থিনিস্ ভারতবর্ষীয়দিগের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি যদিও কোন কোন স্থলে অনবধানতার পরিচয় দিয়াছেন, তথাপি তাঁহার বিবরণ মনোযোগের সহিত পড়িলে প্রাচীন ভারতবর্ষের অবস্থা অনেক পরিমাণে জানিতে পারা যায়। মেগাস্থিনিসের বর্ণনা অনুসারে পাটলীপুত্র গঙ্গা ও শোণের

সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত ছিল। উহা দৈর্ঘ্যে আট মাইল ও বিস্তারে দেড় মাইল। নগরের চারিদিক পরিখাবেষ্টিত ছিল। পরিখার বিস্তার ৪০০ হাত ও গভীরতা ৩০ হাত। পরিখার পর আবার একটি কাষ্ঠময় প্রাচীর। প্রাচীরে ৬৪টি তোরণ ও ৫৭০টি বুরুজ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাণনিক্ষেপের জন্য প্রাচীরের স্থানে স্থানে ছিদ্র ছিল।

ভারতবর্ষ ১১৮টি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রতিরাজ্যে অনেক গুলি নগর ছিল। সে সকল নগর নদীর তটে বা সাগরের উপকূলে অবস্থিত, তৎসমুদয় প্রায় কাষ্ঠ-নির্ম্মিত; আর যে গুলি পাহাড় বা উচ্চ স্থলে অবস্থিত, সে গুলি ইষ্টক বা মৃত্তিকায় প্রস্তুত হইত। ভারতবর্ষীয়েরা নিম্ন-লিখিত সাত শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল;—

১ম শ্রেণী। তত্ত্ববিৎ।—ইঁহারা সকল সম্প্রদায়ের মান্য ও যাগযজ্ঞে লোকের সাহায্যদাতা ছিলেন। বৎসরের প্রারম্ভে ইঁহারা একবার রাজসভায় আহূত হইতেন। কেহ দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি বা মারীভয়প্রভৃতিতে সাধারণের উপকারসাধনের জন্য কোন উপায়ের আবিষ্কার করিয়া থাকিলে, তাহা এই সময়ে সকলের সমক্ষে প্রকাশ করিতেন। রাজা পূর্ব্বে এই সকল বিষয় জানিয়া বিপদ নিবারণে যত্নশীল হইতেন। এসময়ে যদি কেহ তিনবার মিথ্যা বিবরণ প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে যাবজ্জীবন মৌনী হইয়া থাকিতে হইত; আর যিনি প্রামাণিক কথা প্রকাশ করিতেন, তিনি করভার হইতে বিমুক্ত হইতেন। তত্ত্ববিদ্গণ দুই দলে বিভক্ত:—ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণগণেরই সম্মান অধিক। ইঁহারা বাল্যকাল হইতেই নগরের বহিঃস্থ উপবনে বাস করিয়া উপযুক্ত গুরুর নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতেন। ইঁহাদিগকে মাংসাহার ও সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়সুখ হইতে বিরত থাকিতে হইত। ইঁহারা মিতাচার অবলম্বন পূর্ব্বক কুশাসন বা

মৃগচর্ম্মের শয্যায় শয়ন করিতেন। ৩৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই-রূপে থাকিয়া, ইঁহারা গৃহস্থ হইতেন। তখন ইঁহারা কার্পাস বস্ত্র পরিধান, স্বর্ণাভরণধারণ ও মাংসাহার করিতেন এবং বহু সন্তানকামনায় বহু নারীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতেন।

শ্রমণেরা দুই দলে বিভক্ত ছিলেন। এক দল বনে বাস করিতেন। আরণ্য বৃক্ষেরপত্র ও ফল ইঁহাদের প্রধান খাদ্য ও আরণ্য বৃক্ষের বল্কল ইঁহাদের পরিধেয় ছিল। কোন বিষয় জানিতে হইলে, রাজারা ইঁহাদের নিকট দূত পাঠাইতেন। অপর দল, ভিষক্। ইঁহারা যদিও লোকালয়ে বাস করিতেন, তথাপি মিতাচারী ছিলেন, সাধারণতঃ ভাত বা যবের মণ্ড খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। ইঁহাদের ঔষধ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। ইঁহারা তৈল ও প্রলেপকে শ্রেষ্ঠ ঔষধ জ্ঞান করিতেন। ইঁহাদের পথ্যের ব্যবস্থায় রোগের উপশম হইত।

২য় শ্রেণী। কৃষক।—দেশের অধিকাংশ লোক এই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল। ইহারা ধীর, নম্রস্বভাব ও সন্তুষ্টচিত্ত। ইহাদিগকে অন্য কার্য্য করিতে হইত না। ইহারা সকল সময়েই নিরাপদে কৃষি-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। এরূপও দেখা যাইত যে, উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে, নিকটে কৃষকগণ অবাধে ভূমিকর্ষণ করিতেছে। কৃষকেরা আপনাদের স্ত্রীপুত্রের সহিত গ্রামে বাস করিত, কখনও নগরে যাইত না। সৈন্যগণ ইহাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিত। প্রায় সমস্ত জনপদই শস্যসম্পত্তি-শোভিত ক্ষেত্রে পরিবেষ্টিত ছিল। রাজাই ভূমির অধিস্বামী ছিলেন। কৃষকেরা উৎপন্ন দ্রব্যের চতুর্থাংশ পাইত। এইরূপে প্রতিবৎসর অনেক শস্য রাজকীয় ভাণ্ডারে জমা হইত। ইহার কতক অংশ ব্যবসায়ীরা ক্রয় করিত, কতক অংশ রাজ-কর্ম্মচারী ও সৈন্যগণের ভরণপোষণ এবং ভবিষ্য দুর্ভিক্ষাদির নিবারণ জন্য রাখা হইত।

৩য় শ্রেণী। পশু-পালক ও শিকারী।—পশু-পালন, পশু-বিক্রয় ও শিকার ইহাদের উপজীবিকা। ইহারা হিংস্র পশুসমূহের হত্যায় নিযুক্ত থাকিত, এবং শস্যের অনিষ্টকারী বিহঙ্গকুল বিনষ্ট করিয়া কৃষকের উপকার করিত। নগরে বা পল্লীতে ইহাদের নির্দ্দিষ্ট বাস-গৃহ ছিল না। ইহারা প্রায়ই এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইত। এজন্য ইহারা তাম্বুতে বাস করিত।

৪র্থ শ্রেণী। শিল্পকর।—ইহাদের কেহ যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম্ম, কেহ কৃষি-কার্য্যের জন্য যন্ত্র, কেহ বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিত। কোন কোন শিল্পকরকে কর দিতে হইত, কিন্তু যাহারা রাজার জন্য জাহাজ ও অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিত, তাহারা রাজকোষ হইতে আপনাদের ভরণপোষণের অর্থ পাইত। প্রয়োজন অনুসারে বণিকেরা রাজকীয় তরীর অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিয়া, এই সকল জাহাজ ভাড়া করিয়া লইত।

৫ম শ্রেণী। যোদ্ধা।—ইহারা সুশিক্ষিত ও যুদ্ধ-কুশল ছিল। সংখ্যায় ইহারা কেবল কৃষকদিগের নীচেই স্থান পাইত। শান্তির সময়ে ইহাদের কোন কার্য্য থাকিত না। তখন ইহারা কেবল আমোদ-প্রমোদে কালাতিপাত করিত। রাজা সমস্ত সৈন্যের ভরণপোষণ, ও যুদ্ধোপকরণসংরক্ষণের ব্যয়নির্ব্বাহ করিতেন।

৬ষ্ঠ শ্রেণী। চর।—ইহারা রাজ্যের কোথায় কি হইতেছে, তাহা রাজাকে,—যেখানে রাজা নাই, সেখানে প্রধান শান্তি-রক্ষককে জানাইত।

৭ম শ্রেণী। মন্ত্রী।—ইহারা সংখ্যায় অতি অল্প, কিন্তু চরিত্র-গুণ ও অভিজ্ঞতায় অপরাপর শ্রেণীর লোক অপেক্ষা সম্মানিত। রাজার পরামর্শ-দাতা, কোষাধ্যক্ষ ও বিচারপতি এই শ্রেণী হইতে

নির্ব্বাচিত হইতেন। প্রধান শান্তিরক্ষক ও সেনাপতিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

এক শ্রেণীর লোকের সহিত অন্য শ্রেণীর লোকের বিবাহ হইত না, কিংবা এক শ্রেণীভুক্ত লোকের ব্যবসায় অন্য শ্রেণীভুক্ত লোক অবলম্বন করিত না। কেবল যে সে শ্রেণীর লোক তত্ত্ববিৎ হইতে পারিত। লোকে ধুতি পরিত, এবং একখানি উত্তরীয়ের কিয়দংশ মাথায় জড়াইয়া কাঁধে ফেলিয়া দিত। কিন্তু যাহারা সৌখীন ও বেশভুষা-প্রিয়, তাঁহারা স্বর্ণ-খচিত সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতেন। কোন স্থানে যাইবার সময়ে অনুচরগণ তাঁহাদের মস্তকের উপর ছত্র ধরিত। রুচিভেদে লোকে আপনাদের শ্মশ্রু ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত করিত। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ছত্র ব্যবহার করিতেন, এবং শ্বেত চর্ম্মের পাদুকা পায়ে দিতেন। রাজকীয় কার্য্য-প্রণালী সুশৃঙ্খল ছিল। কর্ম্মচারিগণের মধ্যে এক এক শ্রেণী এক এক বিষয় সম্পন্ন করিতেন। দেশের লোক মিতাচারী ছিল। ইহারা যজ্ঞ ভিন্ন মদ্যপান করিত না, সত্য ও ধর্ম্মের সম্মান করিত। ইহাদের মধ্যে চৌর্য্য প্রায় হইত না। চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে চারি লক্ষ লোক থাকিত, কিন্তু তথায় প্রতি দিন দেড় শত টাকার অধিক চুরি হইত না। লোকের সম্পত্তি অরক্ষিত অবস্থাতেই থাকিত। লোকে উচ্ছৃঙ্খল দলের মধ্যে থাকিত না, কদাচিৎ মোকদ্দমা করিতে অগ্রসর হইত। ইহারা প্রায়ই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া গুরুতর কার্য্যনির্ব্বাহ করিত। দণ্ডবিধি বড় ভয়ঙ্কর ছিল। কেহ কোন গুরুতর অপরাধ করিলে তাহার হস্তপদাদি ছেদন করা হইত। পল্লী-সমাজ প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। গ্রামের মণ্ডল পল্লী-সমাজে আধিপত্য করিতেন। ভুমির পরিমাণ, গ্রামের লোকের মধ্যে বিচার, কৃষিক্ষেত্রে যথোপযুক্ত জল-সেচন, করসংগ্রহ, বাণিজ্যের সুবিধা করা, পথের

সংস্কার, এবং সীমা স্থির করার ভার, ইঁহার উপর সমর্পিত থাকিত। ভূমি শস্যশালিনী ছিল। বৎসরে দুই বার শস্য কাটা হইত। সুখাদ্য ফলও প্রচুর পরিমাণে জন্মিত। পথের দূরত্ব-জ্ঞাপক প্রস্তরকীলক সকল স্থানে স্থানে প্রোথিত থাকিত। সাধারণ লোকে অশ্বে, উষ্ট্রে ও গর্দ্দভে চড়িত। রাজা ও ধনশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কেবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাহন হস্তীতে আরোহণ করিতেন। সৈন্যগণ সাধারণতঃ ধনুর্ব্বাণ, ঢাল, বড়শা ও খড়্গ ব্যবহার করিত। পদাতিকের এক হস্তে ধনুর্ব্বাণ, আর এক হস্তে ঢাল থাকিত। ধনুক প্রায় মানুষের সমান ও প্রায় তিন গজ লম্বা ছিল। যোদ্ধারা এই ধনুক মাটিতে রাখিয়া বাম পদ দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া, বাণনিক্ষেপ করিত। অসি লম্বায় তিন হাতের অধিক হইত না। শত্রুপক্ষ অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইলে, যোদ্ধারা দুই হাতে অসি চালাইত। যুদ্ধ-রথে সারথী ব্যতীত দুই জন রথী ও রণ-মাতঙ্গে মাহুত ব্যতীত তিন জন যোদ্ধা থাকিত। উৎসবের সময়ে স্বর্ণরৌপ্য-বিভূষিত হস্তী, শকট-সংযোজিত সুসজ্জিত অশ্ব ও বলদ, এবং সুশিক্ষিত সেনা ধীরে ধীরে চলিত। লোকে রত্নখচিত পাত্র, সুশোভন সিংহাসন ও বিচিত্র বস্ত্রাদি বহন করিত। পোষিত সিংহ, ব্যাঘ্রও সঙ্গে সঙ্গে যাইত, এবং সুকণ্ঠ ও সুদৃশ্য বিহঙ্গ-শোভিত বৃক্ষ সকল বৃহৎ বৃহৎ শকটে চালিত হইত। কন্যা বিবাহ-যোগ্য বয়সে পদার্পণ করিলে, পিতা কোন কোন সময়ে তাহাকে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেন ; যে কেহ শক্তি প্রকাশ করিয়া কোন বিষয়ে জয়লাভ করিতে পারিতেন, তিনিই কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন। কোন স্থানে দাসত্ব-বন্ধন ছিল না। স্ত্রীলোকেরা সতীত্ব-গৌরবে উন্নতা ছিল। রাজা দিবসে নিদ্রা যাইতেন না। রাত্রিতে তিনি এক শয্যায় শুইতেন না,

ষড়যন্ত্রের আশঙ্কায় সময়ে সময়ে শয্যাপরিবর্ত্তন করিতেন। অস্ত্রধারিণী মহিলারা কেহ রথে, কেহ অশ্বে, কেহ হস্তীতে আরোহণ করিয়া মৃগয়ার সময়ে রাজার সঙ্গে সঙ্গে যাইত।

খ্রীষ্টাব্দের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষীয়দিগের সাধারণ অবস্থা কেমন ছিল, তাহা মেগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণে জানা যাইতেছে। গার্হস্থ্য আশ্রমের পর যে, বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয়, মেগাস্থিনিস বোধ হয়, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখান নাই। দ্বিতীয়তঃ, মেগাস্থিনিস যে সাত শ্রেণীর লোকের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা পৃথক্ পৃথক্ সাত জাতি নহে; এই সকল লোক অবলম্বিত কার্য্যভেদে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে নিবেশিত হইয়াছিল। চর ও মন্ত্রী ব্রাহ্মণ। কার্য্যভেদে ইহাদের শ্রেণী বিভিন্ন হইয়াছে। কিন্তু জাতিতে ইহারা বিভিন্ন নহেন। ইহার পর মেগাস্থিনিস্ তত্ত্ববিৎ হইবার সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছেন, তাহা প্রমাদ-দূষিত বোধ হয়। যে সে লোক শ্রমণ হইতে পারিত দেখিয়া, তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, সকল শ্রেণীর লোকই তত্ত্ববিৎ হইতে পারে। কিন্তু জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণেরা যে, অপর লোককে আপনাদের শ্রেণীতে গ্রহণ করেন না, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। এই কয়েকটি অনবধানতার বিষয় ছাড়িয়া দিলে দেখা যায়, খ্রীষ্টাব্দের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে মনুর ব্যবস্থা অনুসারেই সমাজের কার্য্য চলিতেছিল। ব্রাহ্মণেরা অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও মন্ত্রিত্ব করিতেন। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ-ব্যবসায়ী ছিলেন। বৈশ্যেরা শিল্প ও কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। অপেক্ষাকৃত ইতরশ্রেণীর লোকেরা পশু-বিক্রয় প্রভৃতি কার্য্য করিত। শূদ্রদিগের অবস্থা উন্নত হইয়াছিল। তাহারা দাসত্বে নিযুক্ত ছিল না। মেগাস্থিনিস্ ভারতবর্ষে দাসত্বের অভাব দেখিয়াছেন। শূদ্রগণ বৈশ্যদিগের ন্যায় শিল্প ও কৃষিব্যবসায়ী ছিল।

ভারতবর্ষ একচ্ছত্র ছিল না। যেহেতু মেগাস্থিনিস্ ভারতবর্ষে ১১৮টি খণ্ড রাজ্য দেখিয়াছেন। কেবল চন্দ্রগুপ্ত আপনার ক্ষমতা-বলে তাম্রলিপ্তি হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত, সমস্ত ভূখণ্ড অধিকার পূর্ব্বক একটি সাম্রাজ্যস্থাপন করেন। সমগ্র ভারতবর্ষ কোন সময়ে এক রাজার অধীন ছিল না, কোন সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে একতা দেখা যায় নাই।

চন্দ্রগুপ্তের পর মহারাজ অশোকের সময়ে মগধ সাম্রাজ্যের অধিকতর উন্নতি হয়। অশোক চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র ও বিন্দুসারের পুত্র। তিনি কার্য্য-কুশল অমাত্য রাধাগুপ্তের সাহায্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুসীমকে পরাজিত করিয়া পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে যত রাজা রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অশোক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অশোকের প্রতাপ এক সময়ে পাটলীপুত্র হইতে হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত, মালব হইতে কটক পর্য্যন্ত, এবং ত্রিহুতের উত্তরাংশ হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। অশোক অতি কদাকার ছিলেন। প্রথম অবস্থায় তাঁহার প্রকৃতিও সাতিশয় অপ্রীতিকর ছিল। এজন্য তিনি "চণ্ড" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। রাজ্যপ্রাপ্তির কতিপয় বৎসর পরে অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ক্রমে ধর্ম্মাচরণে ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় অশোকের প্রতিপত্তি চারি দিকে বিস্তৃত হয়। অশোক নানাস্থানের মঠপ্রভৃতি নির্ম্মাণে অনেক অর্থ ব্যয় করেন। এই সকল ধর্ম্মসম্মত কার্য্যে অশোকের পূর্ব্বতন "চণ্ড" নাম তিরোহিত হয়। অশোক ধর্ম্মাশোক ও প্রিয়দর্শী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যথাশক্তি চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি বলপ্রকাশ করিয়া, বা তরবারির ভয় দেখাইয়া, কাহাকেও নিজধর্ম্মে আনয়ন করেন নাই, স্থানে স্থানে ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইয়া সরলভাবে সুনীতির উপদেশ দিয়া, সাধা-

রণকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। ধর্ম্ম-প্রচারে অশোকের এই প্রয়াস বিফল হয় নাই। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের যায় পর নাই উন্নতি হয়। মহারাষ্ট্র হইতে কান্দাহার পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া উঠে। ক্রমে সিংহলেও ইহার গতি প্রসারিত হয়। অদ্যাপি অশোকের অনুশাসন-লিপি ইউসফজী দূন (উভয় পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ) হইতে পেশাবর পর্য্যন্ত, এবং পশ্চিমে কাটিগড় ও পূর্ব্বে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত, প্রায় সমস্ত হিন্দুস্থানের ও মধ্য প্রদেশের প্রস্তর-স্তম্ভে বা গিরি-গাত্রে খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল লিপিতে সর্ব্বজীবের প্রতি দয়াপ্রদর্শন, প্রাণিহিংসার প্রতিষেধ, পীড়িত মনুষ্য ও পশুপক্ষীর জন্ম চিকিৎসালয়স্থাপন, পথপার্শ্বে বৃক্ষরোপণ ও কূপখনন প্রভৃতির আদেশ রহিয়াছে। মহারাজ অশোক কত বড় সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, এবং সাম্যের মহিমা ঘোষণাপূর্ব্বক পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড সমূহকে একতা-সূত্রে সম্বদ্ধ করিয়া, কত দূর সুরাজকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা এই সকল অনুশাসন-লিপিতে প্রকাশ পাইতেছে। অশোক স্থানে স্থানে বৌদ্ধদিগের অনেক বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন। মগধে বহুসংখ্য বিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই জন্য উক্ত প্রদেশ এখন বিহার নামে পরিচিত হইতেছে।

অশোকের সময়ে খ্রীষ্টাব্দের ২৪৩ বৎসর পূর্ব্বে পাটলীপুত্র নগরে বৌদ্ধদিগের তৃতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। এক হাজার বৌদ্ধ পুরোহিত এই সমিতিতে উপস্থিত ছিলেন। প্রতারক লোকে বৌদ্ধদিগের পবিত্র হরিদ্রাবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া, আপনাদের কথা বুদ্ধের উপদেশ বলিয়া সাধারণ্যে প্রচারিত করিয়াছিল। এই সঙ্গীতিতে তৎসমুদয়ের সংশোধন হয়।

অশোকের পর কনিষ্ক বৌদ্ধ ধর্ম্মের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা

করেন। কনিষ্ক সমস্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী ভুখণ্ডে আধিপত্য করিয়াছিলেন। কাশ্মীর তাঁহার রাজধানী ছিল। কনিষ্কের সময়ে কাশ্মীর রাজ্য ইয়ারকন্দ ও কোকন হইতে আগ্রা ও সিন্ধু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

কনিষ্ক বৌদ্ধ ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে খ্রীঃ ৪০ অব্দে বৌদ্ধদিগের শেষ অর্থাৎ চতুর্থ সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। এই সমিতিতে পাঁচ শত বৌদ্ধ পুরোহিত সমবেত হইয়া, ধর্ম্মগ্রন্থের তিনখানি টীকা প্রস্তুত করেন।

মহারাজ অশোক ও কনিষ্কের উৎসাহে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিপুষ্টি ও বিস্তৃতি হয়। ধর্ম্ম-প্রচারকেরা চারি দিকে যাইয়া অহিংসা ও সাম্যের মহিমা ঘোষণা করিতে আরম্ভ করেন। অশোকের সময়ে সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রসারিত হইয়াছিল। ইহার ছয় শত বৎসর পরে প্যালিভাষার বৌদ্ধ ধর্ম্ম-পুস্তক সকল লিপিবদ্ধ হয়। এই সময়ে ধর্ম্ম-প্রচারকেরা সিংহল দ্বীপ হইতে ব্রহ্মদেশে গমন করেন। খৃঃ ৬৩৮ অব্দে শ্যামদেশ-বাসিগণ বৌদ্ধধর্ম্ম পরিগ্রহ করে। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে ধর্ম্ম-প্রচারকেরা ভারতবর্ষ হইতে যাবায় যাইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের জয়-পতাকা উড্ডীন করেন। এইরূপে দক্ষিণ দিকে দেশের পর দেশ যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিকট অবনত-মস্তক হইতেছিল, যখন কতিপয় প্রচারক মধ্যএশিয়া অতিক্রম পূর্ব্বক চীনে যাইয়া আপনাদের ধর্ম্ম বদ্ধমূল করেন। চতুর্থ সঙ্গীতির অব্যবহিত পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের জীবনী শক্তি আবার উদ্দীপিত হয়। ধর্ম্মপ্রচারকেরা তিব্বতে, মধ্য এশিয়ার দক্ষিণাংশে ও চীনে গমন করেন। এদিকে পশ্চিমে কাস্পীয় সাগর ও পূর্ব্বে কোরিয়া পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রসারিত হয়। খ্রীঃ ৩৭২ অব্দে কোরিয়া-বাসিগণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম পরিগ্রহ করে। খ্রীঃ ৫৫২ অব্দে কোরিয়ার প্রচারকেরা জাপানে যাইয়া তদ্দেশীয়দিগকে আপনাদের ধর্ম্মে

দীক্ষিত করেন। কেহ কেহ বলেন, আলেক্জান্দ্রিয়া, গ্রীশ ও রোম প্রভৃতি জনপদেও বুদ্ধের মত প্রচারিত হয়। যাহা হউক কোনও ধর্ম্ম পৃথিবীর এত অধিক লোকে আদরপূর্ব্বক পরিগ্রহ করে নাই। পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৫০ জন বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে।

চীনদেশীয় পরিব্রাজক।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম চীনদেশে বদ্ধমূল হইলে তদ্দেশীয় ধর্ম্ম-প্রচারকগণ আপনাদের দেশীয় ভাষায় ধর্ম্মপুস্তকসমূহের অনুবাদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। ভারতবর্ষ বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি-স্থল। কপিল-বস্তু, বুদ্ধগয়া, শ্রাবস্তী, বৌদ্ধদিগের পরম পবিত্র তীর্থ। সুতরাং পবিত্র বুদ্ধমূর্ত্তি ও পবিত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের সংগ্রহমানসে চীন-দেশীয় বৌদ্ধগণ ভারতবর্ষে আসিতে উদ্যত হন। চীন হইতে ভারত-বর্ষে স্থলপথে আসিতে হইলে অনেক দুর্গম স্থান অতিক্রম করিতে হয়। বৃক্ষলতাশূন্য বিস্তীর্ণ মরুভূমি, তুষারমণ্ডিত দুরারোহ পর্ব্বত, অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট পদে পদে পথিকের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু অধ্যবসায়সম্পন্ন চীনদেশীয়গণের অধ্যবসায় বিচলিত হইল না। তাঁহারা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন, পথের এই দুর্গমতা তাঁহাদের নিকট সামান্য বোধ হইল। প্রথমে কয়েক ব্যক্তি স্বদেশ হইতে বাহির হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। কেহ কেহ গোবি মরুভুমিতে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন, কেহ কেহ অগম্য স্থানে উপনীত হওয়াতে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। সাহসী পরিব্রাজক চিটেওয়ান্ খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারত-বর্ষে আসিলেন বটে, কিন্তু সাধারণের নিকটে আপনার অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পরিচয় দিতে পারিলেন না। তাঁহার গ্রন্থ বিনষ্ট বা

বিলুপ্ত হইয়া গেল। অবশেষে খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীতে একটি ক্ষুদ্র দল বহু কষ্টে বহু বাধা অতিক্রমপূর্ব্বক সপ্তসিন্ধুর প্রসন্ন-সলিল-বিধৌত ভূখণ্ডে উপস্থিত হন। এই ক্ষুদ্র দলে পাঁচ জন শ্রমণ ছিলেন। ইঁহাদের অধিনায়কের নাম ফা-হিয়ান। ফা-হিয়ান খ্রীঃ ৩৯৯ অব্দ হইতে খ্রীঃ ৪১৪ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের নানা স্থানে পরিভ্রমণপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ইঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত সংক্ষিপ্ত। ফা-হিয়ানের পর হোয়িসেঙ্‌ ও সঙ-যুনের ভ্রমণবিবরণ প্রকাশিত হয়। এই দুই জন শ্রমণ খ্রীঃ ৫১৮ অব্দে চীনের সম্রাট্‌পত্নীকর্ত্তৃক ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহার এক শত বৎসর পরে আর একজন ধর্ম্মবীর স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। ইনি দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের নানা স্থানপরিদর্শনে ও নানা শাস্ত্রপাঠে ভূয়োদর্শিতা সংগ্রহপূর্ব্বক স্বদেশে যাইয়া সাধারণের সম্পূজিত হইয়াছিলেন। ইঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত গবেষণা ও দূরদর্শিতায় পরিপূর্ণ। ইনি ভারতবর্ষের তদানীন্তন অবস্থার যথাযথ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার সাধনা যেমন বলবতী ছিল, সিদ্ধিও তেমনি মহীয়সী হইয়া উঠিয়াছিল। ইনি আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বহুদর্শিতা লাভের জন্য বিঘ্নবিপত্তিপূর্ণ সময়ে রাজার অজ্ঞাতসারে, রাজকীয় আদেশের বিরুদ্ধে স্বদেশ হইতে যাত্রা করেন, এবং শেষে অভীষ্ট বিষয় সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বদেশে যাইয়া রাজদত্ত সম্মানে গৌরবান্বিত হন। চীনের এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অবিচলিতহৃদয় ধর্ম্মবীরের নাম হিউএন্‌ থ্‌ সঙ্গ্‌।

হিউএন্‌ থ্‌ সঙ্গ্‌ চীনদেশের কোন একটি উপবিভাগের নগরে খ্রীঃ ৬০৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে চীন সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী অন্তর্বিদ্রোহে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। যাহাহউক, হিউএন্‌ থ্‌ সঙ্গের পিতা কোনও রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন,

শেষে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সন্তানচতুষ্টয়কে শিক্ষা দিতে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। এই চারি সন্তানের মধ্যে দুইটি বাল্যকালেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সারগ্রাহিতার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ইহাদের অন্যতরের নাম হিউএন্ থ্ সঙ্। হিউএন্ থ্ সঙ্ প্রথমে একটি বৌদ্ধ মঠে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকটেও তিনি অনেক বিষয় শিখিয়াছিলেন। যাহা হউক, বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া হিউএন্ থ্ সঙ্ বৌদ্ধ যতির শ্রেণীতে নিবেশিত হন। এই সময়ে তাঁহার বয়স তের বৎসর।

পরবর্ত্তী সাত বৎসর হিউএন্ থ্ সঙ্ ভ্রাতার সহিত প্রধান প্রধান তত্ত্ববিৎ ও প্রধান অধ্যাপকের উপদেশ শুনিবার জন্য নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ান। সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহ থাকাতে তাঁহার নির্জ্জনপাঠের অনেক ব্যাঘাত হইয়াছিল। সময়ে সময়ে তিনি দূরতর স্থানের নির্জ্জন প্রদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ অশান্তিতে—বিদ্রোহের এইরূপ বিঘ্নবিপত্তিপূর্ণ সময়েও হিউএন্ থ্ সঙ্ অধ্যয়ন হইতে বিরত হয় নাই। শাস্ত্রালোচনা তাঁহার একটি পবিত্র আমোদ ছিল। তিনি যে স্থানে গিয়াছেন, সেই স্থানেই কোন নূতন বিষয় শিখিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছেন। কুড়ি বৎসর বয়সে হিউএন্ থ্ সঙ্ বৌদ্ধ পুরোহিতের পদে অধিষ্ঠিত হন। এই নবীন বয়সে তিনি জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় স্বদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। আপনাদের পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক, বুদ্ধের জীবনী ও উপদেশ এবং স্বদেশের দর্শনশাস্ত্র, সমস্তই তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছিল। তিনি চীনের প্রধান প্রধান শাস্ত্রালোচনার স্থানে, ছয় বৎসর অবিচ্ছিন্নভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ছয় বৎসর অবিচ্ছিন্নভাবে প্রধান প্রধান তত্ত্ববিদ্‌গণের পাদমূলে বসিয়া ধর্ম্মোপদেশে নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু

শেষে এই সকল তত্ত্ববিৎ তাঁহার সমুদয় প্রশ্নের উত্তরদানে অসমর্থ হইলেন। বুদ্ধ যেমন জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার জন্য প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের ছাত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, হিউএন্ থ্ সঙ্গ্ ও তেমনি অনেকের ছাত্রত্ব গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কোথাও প্রকৃত তত্ত্বলাভ করিতে পারিলেন না। তিনি স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত ধর্ম্ম-গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার সন্দেহ অধিকতর বদ্ধমূল হইল। তিনি মূলগ্রন্থ পড়িবার জন্য ভারতবর্ষে আসিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। ফা-হিয়ান প্রভৃতি যে সকল পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, হিউএন্ থ্ সঙ্গ্ তাঁহাদের গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন। এখন তিনিও এই সকল পরিব্রাজকের ন্যায় ভারতবর্ষে আসিয়া মূল ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, চীন সাম্রাজ্য অন্তর্বিদ্রোহে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ সাম্রাজ্যের সীমান্তভাগ অতিক্রম করিতে পারিত না। এই সময়ে হিউএন্ থ্ সঙ্গ্ ও আর কয়েক জন পুরোহিত পরিভ্রমণে বাহির হইবার জন্য সম্রাটের নিকট আবেদন করিলেন। আবেদন অগ্রাহ্য হইল। হিউএন্ থ্ সঙ্গের সহযোগিগণ নিরস্ত হইলেন। কিন্তু হিউএন্ থ্ সঙ্গ্ ভারতবর্ষে আসিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্খলিত হইল না। তিনি প্রাণপণে আপনার প্রতিজ্ঞার পালনে উদ্যত হইলেন।

খ্রীঃ ৬২৯ অব্দে ছাব্বিশ বৎসর বয়সে হিউএন্ থ্ সঙ্গ্ এইরূপ অবিচলিতহৃদয়ে বুদ্ধের পবিত্র নাম স্মরণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমে পীত নদীর (হোয়াং হো) তীরে আসিলেন। এইস্থানে ভারতবর্ষ-যাত্রিগণ সমবেত হইয়া থাকে। স্থানীয় শাসন-কর্ত্তা, সকলকে রাজ্যের সীমান্তভাগ অতিক্রম করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। হিউএন্ থ্ সঙ্গ্ আপনার সমধর্ম্মাদিগের সাহায্যে শান্তি-রক্ষকগণের দৃষ্টি পরিহার পূর্ব্বক যাত্রা

করিলেন। অবিলম্বে চরগণ তাঁহার অন্বেষণে প্রেরিত হইল। কিন্তু এই তরুণ-বয়স্ক বৌদ্ধ যতি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এরূপ অসাধারণ অধ্যবসায় ও এরূপ অবিচলিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞার নিদর্শন দেখাইলেন যে, তাঁহারা আর কোনরূপ আপত্তি না করিয়া তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। এ পর্য্যন্ত দুই জন বন্ধু তাঁহার সঙ্গে আসিতেছিলেন। এই স্থানে তাঁহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। হিউএন্ থ্ সঙ্ পরিচালক-বিহীন ও বন্ধু-বিহীন হইয়া পড়িলেন। তিনি ভক্তিভাবে উপাসনা করিয়া আপনার বলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে এক ব্যক্তি তাঁহার পথ-প্রদর্শক হইতে সম্মত হইল। হিউএন্-থ্ সঙ্ ইহার সহিত নিরাপদে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এই পথ-প্রদর্শকও মরুভূমির নিকটে আসিয়া, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। এখন আরও পাঁচটি রক্ষাগৃহ অতিক্রম করা বাকী ছিল। প্রতি রক্ষাগৃহে রক্ষিগণ দিবারাত্রি পাহারা দিত। এদিকে সুবিস্তৃত মরুভূমিতে অশ্বের পদ-চিহ্ন বা মৃত জীবের কঙ্কাল ব্যতীত পথ-জ্ঞাপক অন্য কোন চিহ্ন ছিল না। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হিউএন্ থ্ সঙ্ বিচলিত হইলেন না। তিনি মৃগতৃষ্ণিকায় বিভ্রান্ত হইয়াও ধীরভাবে প্রথম রক্ষাগৃহের নিকট উপনীত হইলেন। এইস্থানে রক্ষিবর্গের নিক্ষিপ্ত বাণে তাঁহার প্রাণ-বায়ুর অবসান হইতে পারিত। কিন্তু এক জন ধর্ম্মনিষ্ঠ বৌদ্ধ এই স্থানের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি এই সাহসী তীর্থযাত্রীকে যাইতে অনুমতি করিলেন, এবং অন্যান্য রক্ষাগৃহে যাইতে ইঁহার কোনরূপ অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য তত্রত্য অধ্যক্ষদিগের নামে এক একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন। হিউএন্ থ্ সঙ্ রক্ষাগৃহ সকল অতিক্রম করিয়া, আর একটি মরুভূমিতে উপস্থিত হইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই স্থানে তিনি পথহারা হইয়া পড়িলেন। যে চর্ম্ম-ভাণ্ডে তিনি জল

আনিতেছিলেন, হঠাৎ তাহা ফাটিয়া গেল। হিউএন্ থ্ সঙ্গ্ পথহারা হইয়া সেই ভীষণ মরুভূমিতে জলের অভাবে বড় কষ্টে পড়িলেন। তাঁহার অটল সাহস ও অধ্যবসায় এতক্ষণে বিচলিত-প্রায় হইল। তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। অকস্মাৎ তাঁহার গতিরোধ হইল। অকস্মাৎ যেন কোন অভাবনীয় শক্তির প্রভাবে তাঁহার সাহস ও অধ্যবসায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। হিউএন্ থ্ সঙ্গ্ কহিলেন, "আমি শপথ করিয়াছি, যাবৎ ভারতবর্ষে উপনীত না হইব, তাবৎ প্রতিনিবৃত্ত হইব না। তবে কেন এমন দুর্ম্মতি হইল? কেন আমি ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলাম? পশ্চিমে যাইতে প্রাণ যায় তাহাও ভাল, তথাপি জীবিত অবস্থায় পূর্ব্ব দিকে ফিরিব না।" হিউএন্ থ্ সঙ্গ্ আবার পশ্চিমদিকে ফিরিলেন, এক বিন্দু জল পান না করিয়া, চারি দিন পাঁচ রাত্রি, সেই ভয়ঙ্কর মরুভূমি দিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে কেবল পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক হইতে উপদেশ সকলের আবৃত্তি করিয়া হৃদয়ের শান্তিসম্পাদন করিতেন। তরুণবয়স্ক ধর্ম্মবীর এইরূপে কেবল ধর্ম্মোপদেশের বলে বলীয়ান্ হইয়া, একটি বৃহৎ হ্রদের তটে উপস্থিত হইলেন। এই জনপদ তাতারদিগের অধিকৃত। তাতারেরা হিউএন্ থ্ সঙ্গকে আদরসহকারে গ্রহণ করিল। একজন তাতার ভূপতি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি হিউএন্ থ্ সঙ্গ্‌কে আপনার প্রজাদিগের ধর্ম্মোপদেষ্টা করিয়া রাখিবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। হিউএন্ থ্ সঙ্গ্ ইহাতে সম্মত হইলেন না। তাতার ভূপতি শেষে বড় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু হিউএন্ থ্ সঙ্গের হৃদয় বিচলিত হইল না। হিউএন্ থ্ সঙ্গ্ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "ভূপতির ক্ষমতা আছে, কিন্তু আমার মন ও আমার ইচ্ছার উপর তিনি কোনও ক্ষমতাস্থাপন করিতে পারেন না।" এইরূপে আবদ্ধ হইয়া, হিউএন্ থ্ সঙ্গ্ তাতাররাজ্যে আপনার দেহপাত করিবার জন্য আহারপান

হইতে বিরত হইলেন। তাতার ভূপতি এই দরিদ্র যতিকে আপনার মতে আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে বাধ্য হইয়া, তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। হিউএন্ থ্ সঙ্ এক মাস কাল এই ভূপতির রাজ্যে আবদ্ধ ছিলেন, একমাস কাল ভূপতি ও তদীয় পারিষদগণ আপনাদের পবিত্রস্বভাব অতিথির নিকট ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়াছিলেন। এখন তাতার-রাজের আদেশে বহুসংখ্য অনুচর হিউএন্ থ্ সঙ্গের সহিত যাইতে প্রস্তুত হইল। যে চব্বিশ জন রাজার অধিকার দিয়া, এই তীর্থযাত্রীর দল যাইবে, তাতার ভূপতি তাঁহাদের প্রত্যেকের নামে এক এক খানি পত্র দিলেন। হিউএন্ থ্ সঙ্ এই অনুচরগণের সহিত অনেকগুলি তুষার-মণ্ডিত দুর্গম গিরি অতিক্রম পূর্ব্বক বাক্ত্রিয়া ও কাবুলিস্তান দিয়া, ভারতবর্ষে উপনীত হন। এই সকল তুষার-সমাচ্ছাদিত পর্ব্বত-শ্রেণী অতিক্রম করিতে সাত দিন লাগিয়াছিল। ইহার মধ্যে তাঁহার চৌদ্দ জন অনুচর বিনষ্ট হয়।

হিউএন্ থ্ সঙ্ মধ্যএশিয়ায় সভ্যতার উন্নতি দেখিয়া সন্তুষ্ট হন। খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে মধ্যএশিয়া বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। লোকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা ব্যবহার করিত। স্থানে স্থানে বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল মঠে বৌদ্ধ ধর্ম্ম-পুস্তক সকল অধীত হইত। কৃষি-কার্য্যের অবস্থা ভাল ছিল। ধান্য, যব, আঙ্গুর প্রভৃতি পর্য্যাপ্তপরিমাণে উৎপন্ন হইত। অধিবাসীরা রেশম ও পশমের পরিচ্ছদ পরিধান করিত। প্রধান প্রধান নগরে সঙ্গীত-ব্যবসায়ীরা গান-বাদ্যে আসক্ত থাকিত। এই জনপদে বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই প্রাধান্য ছিল, স্থানে স্থানে অগ্নির উপাসনাও হইত। প্রাচীন সময়ে গ্রীশের রাজধানী এথেন্স্ যেমন বিদ্যা ও সভ্যতার প্রধান স্থান বলিয়া, সমস্ত ইউরোপে

সম্মানিত হইত, এ সময়ে মধ্যএশিয়ায় সমরখন্দ নগরেরও তেমন প্রতিপত্তি ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অধিবাসীরা সমরখন্দ-বাসীদিগের আচারব্যবহারের অনুকরণ করিত। বিষয়প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে মধ্য এশিয়ার অবস্থা এস্থলে বর্ণিত হইল। হিউএন্ থ্সঙ্গ্ যেস্থানে গিয়াছেন, যাহা কিছু দেখিয়াছেন, তৎসমুদয়েরই বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। দূরদর্শিতার গভীরতায়, ভাবের উচ্চতায় ও বর্ণনার প্রাঞ্জলতায়, তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে অতি উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হওয়াতে ঐতিহাসিক ক্ষেত্র অভিনব প্রশান্ত জ্যোতিতে আলোকিত হইয়াছে।

হিউএন্ থ্ সঙ্গ্ মধ্য এশিয়া অতিক্রম পূর্ব্বক কাবুল দিয়া, পুরুষপুরে (পেশাবর) উপনীত হন, এবং ঐস্থান হইতে কাশ্মীরে গমন করেন। ইহার পর পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চল অতিক্রম পূর্ব্বক মগধে উপস্থিত হন। এতদিনে এই অব্যবসায়-সম্পন্ন ধর্ম্মবীরের বাসনা চরিতার্থ হয়। বিদেশী ধর্ম্মবীর আপনাদের পবিত্র তীর্থ—কপিলবস্তু, শ্রাবস্তী, বারাণসী, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি দর্শন করিলেন, মধ্য ভারতবর্ষের অনেক স্থান দেখিলেন, বাঙ্গালায় যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থার অনুসন্ধান লইলেন, দক্ষিণাপথে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ভুয়োদর্শিতা সংগ্রহ করিলেন। একে একে ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় প্রধান স্থানই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি প্রধান প্রধান স্থানে প্রধান প্রধান লোকের সহিত আলাপ করিয়া, এবং প্রধান প্রধান সংস্কৃত ও বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ সকল পড়িয়া ক্রমে জ্ঞানী ও বহুদর্শী হইয়া উঠিলেন। সহায়-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যাহা করিতে পারেন নাই, একটি অসহায়, বিদেশী দরিদ্র যুবক আপনার সাহস, উদ্যম এবং আপনার অসাধারণ ধর্ম্ম-নিষ্ঠার উপর নির্ভর করিয়া, তাহা সম্পন্ন করিয়া তুলিলেন। দক্ষিণাপথ হইতে হিউএন্ থ্

সঙ্ সিংহল দ্বীপে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু কাঞ্চীপুরে (কঞ্চিবিরম্) আসিয়া শুনিলেন, অন্তর্বিদ্রোহে সিংহল দ্বীপে নানা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এজন্য তিনি সিংহলে গেলেন না, কাঞ্চীপুর হইতে করমণ্ডল উপকূল দিয়া, কিয়দ্দূরে আসিয়া, দক্ষিণাপথ অতিক্রম পূর্ব্বক মলবার উপকূলে আসিলেন, এবং সে স্থান হইতে সিন্ধুনদ দিয়া উত্তরপশ্চিম প্রদেশের প্রধান প্রধান নগর দর্শন পূর্ব্বক মগধে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। হিউএন্ থ্ সঙ্ এই স্থানে তাঁহার সদাশয় বন্ধুগণের সহিত কিছুদিন একত্রে বাস করিয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করেন। ইহার পর এই পরিব্রাজক স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি পঞ্জাব ও কাবুলিস্তান দিয়া মধ্য এশিয়ার উন্নত ভূখণ্ডে আসিলেন, এবং তুর্কিস্তান হইতে পূর্ব্বতাতারের কাশগড়, ইয়ারখন্দ ও খোতান নগরে কিছুকাল থাকিয়া, ষোল বৎসর ভ্রমণ, অধ্যয়ন, ও বিঘ্নবিপত্তির সহিত সংগ্রামের পর খ্রীঃ ৬৪৫ অব্দে আপনার গরীয়সী জন্মভূমিতে পদার্পণ করিলেন।

এইরূপে সদাশয় ধর্ম্মবীরের ভ্রমণকার্য্য সমাপ্ত হইল, এইরূপে সদাশয় ধর্ম্মবীর গৌরব-শ্রীতে সমুন্নত হইয়া দীর্ঘকালের পর স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার প্রতিপত্তি এখন চারি দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। সম্রাট্ এই প্রতিপত্তিশালী দরিদ্র পরিব্রাজকের উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিতে ক্রটি করিলেন না। এক সময়ে চরগণ যাঁহার অনুসন্ধানে প্রেরিত হইয়াছিল, সশস্ত্র শান্তিরক্ষকগণ যাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার আদেশ পাইয়াছিল, তিনি এখন প্রভুত সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইলেন। চীনের রাজধানীতে তাঁহার প্রবেশসময়ে মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। রাজপথ সকল কার্পেটে আচ্ছাদিত হইল, তাহার উপর সুগন্ধি পুষ্পসমূহ শোভা বিকাশ করিতে লাগিল, স্থানে স্থানে জয়পতাকা

সকল বায়ুভরে প্রকম্পিত হইতে লাগিল, সৈনিক পুরুষগণ পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। প্রধান প্রধান রাজ-পুরুষেরা আপনাদের বিখ্যাত পরিব্রাজককে অভিনন্দন করিয়া আনিতে গেলেন। দরিদ্র ধর্ম্মবীর আপনার কৃতকার্য্যতার গৌরবে উন্নত হইলেও বিনম্রভাবে এই মহোৎসবের মধ্যে রাজ-ধানীতে প্রবেশ করিলেন। বৌদ্ধ পুরোহিতগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। হিউএন্ থ্ সঙ্ বুদ্ধের স্বর্ণ, রৌপ্য ও চন্দনকাষ্ঠের প্রতিমূর্ত্তি, এবং ৬৫৭ খানি গ্রন্থ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সম্রাট ইহাতে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া, আপনার সুসজ্জিত প্রাসাদে তাঁহাকে যথোচিত সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার বিদ্যা, অভিজ্ঞতা ও গুণের প্রশংসা করিয়া, তাঁহাকে সাম্রাজ্যের একটি প্রধান কর্ম্মগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইউএন্ থ্ সঙ্ বিনীতভাবে ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া, বুদ্ধের জীবনী ও নিয়মা-বলীর পর্য্যালোচনায় আপনার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করি-বার অভিপ্রায় জানাইলেন। সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার জন্য একটি মঠ নির্দ্দিষ্ট হইল। এই স্থানে তিনি অপরাপর বৌদ্ধ পুরোহিত-গণের সহিত একত্র হইয়া, ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত পুস্তক-সমূহের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত শীঘ্র লিখিত ও প্রকাশিত হইল। কিন্তু সংস্কৃত পুঁথি সমূহের অনুবাদে তাঁহার অনেক দিন লাগিয়া ছিল। কথিত আছে, হিউএন্ থ্ সঙ্ বহুসংখ্য সহযোগীর সাহায্যে ৭৪০ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করেন। এই সকল গ্রন্থ ১,৩৩৫ খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছিল। অনুবাদ-সময়ে তিনি প্রায়ই গ্রন্থের দুরূহ অংশের অর্থপরিগ্রহের জন্য নির্জ্জনে চিন্তা করিতেন। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মুখমণ্ডল হঠাৎ

প্রসন্ন হইত, হঠাৎ যেন কোন অচিন্ত্যপূর্ব্ব আলোকে তাঁহার নেত্র-দ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। ঘোর অন্ধকারময় স্থানে পরিভ্রমণ-সময়ে পথিক সহসা সূর্য্যের আলোক পাইলে যেমন প্রফুল্ল হয়, হিউএন্ থ্ সঙ্ চিন্তা করিতে করিতে দুরূহ অংশের তাৎপর্য্য-পরিগ্রহ করিয়া, তেমন প্রফুল্ল হইতেন।

এইরূপে ধর্ম্মচিন্তা, গ্রন্থপ্রণয়ন ও গ্রন্থ প্রচার করিয়া, হিউএন্ থ্ সঙ্ ক্রমে ঐহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত হইলেন। তিনি মৃত্যুসময়ে আপনার সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিলেন, এবং আত্মীয় ও বন্ধুদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের নিকট বিদায় লইলেন। তিনি প্রশান্তভাবে কহিলেন, "সৎ-কার্য্য প্রযুক্ত আমি যে কিছু প্রশংসা পাইতে পারি, তাহা কেবল আমার নিজের প্রাপ্য নয়। অপরাপর লোকেও তাহার অংশ পাইবার যোগ্য।" খ্রীঃ ৬৬৪ অব্দে হিউএন্ থ্ সঙ্গের মৃত্যু হয়। প্রায় এই সময়ে বিজয়োন্মত্ত মুসলমানেরা প্রাচ্য ভূখণ্ড শোণিত-রঞ্জিত করিতেছিল, এবং এই সময়ে জর্ম্মণির অন্ধকারময় আরণ্য প্রদেশে খ্রীষ্টধর্ম্মের আলোক ধীরে ধীরে বিকাশ পাইতেছিল।

এই সংক্ষিপ্ত জীবনীতে হিউএন্ থ্ সঙ্গের ন্যায় অসাধারণ ব্যক্তির অসাধারণ চরিত্র পরিস্ফুট হওয়া একান্ত অসম্ভব। ধর্ম্ম-বীর কিরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অবিচলিত উৎসাহের সহিত কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাই দেখাইবার জন্য অতি সংক্ষেপে তদীয় জীবনী লিখিত হইল। সংসারের সমস্ত প্রলো-ভন পরিত্যাগ করিয়া, তিনি কিরূপ ধীরতার সহিত ভয়ঙ্কর মরু-ভূমি অতিবাহন করিয়াছিলেন, কিরূপ দৃঢ়তার সহিত তাতার ভূপতির অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, কিরূপ স্থিরতার সহিত ভারতবর্ষে বৌদ্ধ বিদ্যালয়ের নির্জ্জন গৃহে দীর্ঘ-কাল বিদেশীয় ভাষার গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং শেষে

স্বদেশে যাইয়া, কিরূপ নম্রতার সহিত সম্রাটের সমক্ষে প্রধান রাজকীয় পদগ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এই সংক্ষিপ্ত জীবনীতে জানিতে পারা যায়। দূরদর্শিতায় ও অভিজ্ঞতায় তিনি তদানীন্তন সময়ে এক জন শ্রেষ্ঠ তত্ত্ববিৎ বলিয়া সম্মানিত ছিলেন। কোন কোন অংশে তাঁহার দুর্ব্বলতা ছিল। তিনি সাতিশয় কৌতূহলপর ছিলেন। অনেক অলৌকিক বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিত। কিন্তু তাঁহার অন্যান্য গুণ এই দুর্ব্বলতা একবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার চরিত্রে স্বার্থপরতার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। ধর্ম্মের জন্য তিনি সমস্ত পার্থিব সুখ পরিত্যাগ করিয়া অম্লানভাবে নানাবিধ কষ্ট সহিয়াছিলেন। এইরূপ আত্মত্যাগ ও এইরূপ আত্মসংযমের বলে তাঁহার প্রতিপত্তি বদ্ধমূল হয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সাধুতা তাঁহাকে সাধারণের বরণীয় করিয়া তুলে। তিনি কখনও কোনরূপ অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই, এবং কখনও পবিত্রতা হইতে বিচ্যুত হইয়া, আপনার হৃদয় কলঙ্কিত করেন নাই। তিনি আচারব্যবহার ও শারীরিক গঠনে সম্পূর্ণ বিদেশীয় হইলেও, সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের জ্ঞানী ও বীরপুরুষেরা যেমন স্বদেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, গ্রীশের যুদ্ধ-বীরেরা যেমন স্বাধীনতার জন্য সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন, পৃথিবীর কেন্দ্রের আবিষ্কারকেরা যেমন বিজ্ঞানের জন্য স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত হইয়াছেন, এই দরিদ্র ধর্ম্মবীরও তেমনি ধর্ম্মের জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করেন। হিউএন্ থ্ সঙ্ এই সকল মহাপুরুষের সহিত এক শ্রেণীতে স্থান পাইবার অধিকারী, এবং হিউএন্ থ্ সঙ্ এই সকল মহাপুরুষের ন্যায় সাধারণের নিকট শ্রদ্ধা ও প্রীতি পাইবার যোগ্য।

হিউএন্ থ্ সঙ্গের সময়ে ভারতবর্ষে হিন্দু ও বৌদ্ধ, উভয় ধর্ম্মেরই প্রাধান্য ছিল। হিন্দু দেবমন্দিরের পার্শ্বে বৌদ্ধ মঠ আপনার

গৌরবরক্ষা করিতেছিল। ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভয়েই নিরাপদে ও নিরুদ্বেগে আপনার ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন।

হিউএন্থ্সঙ্ যে পথে ভারতবর্ষে উপনীত হন, সে পথের পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবস্থা উন্নত ছিল। কপিশা রাজ্যে (বর্ত্তমান কাবুলিস্তান) এক জন ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিতেন। এই স্থানে এক শতটি মঠে ছয় হাজার শ্রবণ থাকিতেন। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্য দেব-মন্দির ছিল। সন্ন্যাসিগণ কেহ উলঙ্গ অবস্থায় থাকিতেন, কেহ সমস্ত দেহে ভস্ম মাখিতেন, কেহ বা কপাল-সমূহ অলঙ্কারের ন্যায় ধারণ করিতেন। পেশাবর এই কপিশা রাজ্যের অধীন ছিল। এই স্থানে মহারাজ অশোক ও কনিষ্কের নির্ম্মিত বহুসংখ্য ভগ্ন মঠ সর্ব্বসংহারক কালের অনন্ত শক্তির পরিচয় দিতেছিল। কাশ্মীরের রাজা হিন্দুধর্ম্মের পরিপোষক ছিলেন, সুতরাং এই রাজ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। থানেশ্বর ও মথুরায় হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় বৌদ্ধ ধর্ম্মেরও প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছিল। হিউএন্থ্সঙ্ কুরুক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ক্ষত্রবীরগণের বৃহদাকার কঙ্কাল-সমূহ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে কান্যকুব্জ রাজ্য সমৃদ্ধ ছিল। বৈশ্যবংশীয় হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য এই স্থানের অধিপতি ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে ও পশ্চিমে অনেক রাজ্য আপনার জয়-পতাকায় শোভিত করেন। ভারতবর্ষের আঠার জন রাজা তাঁহার করদ হন। মহারাষ্ট্র-রাজ পুলকেশ ব্যতীত সাহসে ও পরাক্রমে, ভারতবর্ষে শিলাদিত্যের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। শিলাদিত্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের এক জন প্রধান পরিপোষক ছিলেন। তিনি এই ধর্ম্মের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করেন। অযোধ্যায় হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া উঠিতেছিল। প্রয়াগে হিন্দুধর্ম্মেরই প্রাদুর্ভাব দেখা যাই-

ছিল। শ্রাবস্তীতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ক্রমে অবনতি হইতেছিল। হিউএন্ থ্ সঙ্ বুদ্ধের জন্মভূমি কপিলবস্তুর ভগ্নাবশেষ দেখিয়া দুঃখিত হন। বুদ্ধ, বারাণসীপ্রভৃতি যে কয়েকটি নগরে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা ক্রমে বদ্ধমূল হইতেছিল। বৈশালী ভগ্নদশাপন্ন ও উহার মঠ সকল পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। মগধের পঞ্চাশটি মঠে দশ সহস্র শ্রমণ বাস করিতেন। এতদ্ব্যতীত হিন্দুদিগের বহুসংখ্য দেবমন্দির ছিল। যে প্রাচীন পাটলীপুত্র এক সময়ে সুরাজকতা ও সমৃদ্ধির মহিমায় ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যকে অধঃকৃত করিয়াছিল, কালের কঠোর আক্রমণে এই সময়ে তাহার পূর্ব্বগৌরব, বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। উহার বহুসংখ্য অট্টালিকা ও বহুসংখ্য মঠের ভগ্নাবশেষ প্রায় চৌদ্দ মাইল ব্যাপিয়া রহিয়াছিল। হিউএন্ থ্ সঙ্ বাঙ্গালা, দক্ষিণাপথ ও মধ্যভারতবর্ষে গমন করেন। এই সকল জনপদের কোথাও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য, কোথাও বা বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি পরিলক্ষিত হয়। আসামে হিন্দুধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল। এই স্থানের অধিপতি ব্রাহ্মণ। ইনি 'কুমার' বলিয়া প্রসিদ্ধ। কুমার, মহারাজ শিলাদিত্যের করদ ছিলেন। তাম্রলিপ্তি (তমোলুক) একটি প্রধান বন্দর ছিল। হিউএন্ [illegible] নে বাণিজ্যের উন্নতি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলে[illegible] মহারাষ্ট্র[illegible]শেষ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা রাজপু[illegible]য় দীর্ঘকা[illegible] সরল-স্বভাব, সাহসী ও বলিষ্ঠ ছিল। কোপনস্বভাব হইলেও তাহারা কৃতজ্ঞতা হইতে বিচ্যুত হইত না। তাহারা মিত্রের সাহায্য ও শত্রুর অনিষ্ট করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। তাহাদের এতদূর আত্ম-সম্মানবোধ ছিল যে, শত্রুকে পূর্ব্বে না জানাইয়া, তাহার অপকারে অগ্রসর হইত না। তাহারা পলায়িতের পশ্চা-

দ্ধাবিত হইত, কিন্তু শরণাগতের উপকার করিত। তাহাদের সেনাপতিরা যুদ্ধে পরাজিত হইলে নারীজাতির পরিচ্ছদ পরিত, এবং প্রায়ই আত্মহত্যা করিয়া, আত্মাবমাননার শান্তি করিত। তাহারা যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে মদিরাপানে উন্মত্ত হইত, এবং আপনাদের হস্তীগুলিকেও এইরূপে প্রমত্ত করিয়া তুলিত। যুদ্ধোন্মত্ত থাকিলেও মহারাষ্ট্রীয়গণ শাস্ত্রালোচনায় অমনোযোগী ছিল না। তাহারা যথানিয়মে বিদ্যাভ্যাস করিত। মহারাষ্ট্রীয়দের প্রায় অর্দ্ধাংশ বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল। ক্ষত্রিয়রাজ পুলকেশ এই সময়ে মহারাষ্ট্রে আধিপত্য করিতেছিলেন। ইনি যেমন উদারস্বভাব, তেমনই অভিজ্ঞ ছিলেন। ইঁহার দানশক্তির অবধি ছিল না। প্রজারঞ্জকতাগুণে ইনি সাধারণের সাতিশয় প্রিয় ছিলেন। প্রজারা কায়মনোবাক্যে ইঁহার আদেশ পালন করিত। মহারাজ শিলাদিত্য অনেক স্থান আপনার বিজয়পতাকায় শোভিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি মহারাষ্ট্ররাজ পুলকেশকে পরাজিত করিতে পারেন নাই।

হিউএন্ থ্সঙ্গ্ ভারতবর্ষীয়দিগের সরলতা ও সাধুতার প্রশংসা করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়েরা প্রবঞ্চনা বা কোন বিষয় জাল করিত না। তাহারা শপথদ্বারা আপনাদের প্রতিশ্রুতি দৃঢ়তর করিত, এবং কোনরূপ পাপ করিলে প[illegible] শাস্তিভোগের আশঙ্কা[illegible] থাকিত। [illegible]চারব্যবহার সরল ও ভদ্র, এব[illegible] স্বভাব শান্ত ও নম্র ছিল। হিন্দুদের বিচারকার্য্য সাতিশয় সরলভাবে সম্পন্ন হইত। কঠোরতম শাস্তি ছিল না। বিদ্রোহীদিগের প্রতিও মৃত্যুদণ্ডাদেশ হইত না। রাজদ্রোহিগণ কেবল যাবজ্জীবন কারাবদ্ধ থাকিত। বেত্রাঘাতের নিয়ম ছিল না। কিন্তু যাহারা ন্যায়ের অন্যথাচরণ করিত, বিশৃঙ্খলা হইতে বিচ্যুত হইত, কিংবা পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য-

সম্পাদনে ঔদাসীন্য দেখাইত, তাহাদের হস্তপদ বা নাসাকর্ণ ছেদন করা হইত। প্রকাশ্য স্থানে সাধারণের সমক্ষে দণ্ডবিধান করা হইত না। দোষস্বীকার করাইবার জন্য বেত্রাঘাতের নিয়ম ছিল না। যদি অপরাধী সরলভাবে আপনার দোষ স্বীকার করিত, তাহা হইলে তাহার প্রতি যথাযোগ্য দণ্ড বিহিত হইত। কিন্তু যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া, আপনার দোষগোপন করিত, তাহা হইলে উত্তপ্ত জল, অগ্নি, গুরুতর ভার বা বিষপ্রয়োগ দ্বারা তাহার দোষাদোষ নির্দ্ধারিত হইত।

মেগাস্থিনিসের ন্যায় হিউএন্ থ্ সঙ্গ্ও ভারতবর্ষে অনেকগুলি খণ্ড রাজ্য দেখিয়াছেন। এক আর্য্যাবর্ত্তেই এইরূপ ৭০টি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। প্রতি রাজ্যের রাজারা আপনাদের ইচ্ছানুসারে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেন। ভারতবর্ষ বিভিন্ন জাতীয় লোকের আবাসভূমি। এই সকল লোকের ভাষা ও আচার ব্যবহারও বিভিন্ন। এতদ্ব্যতীত সমুন্নত পর্ব্বত, বেগবতী তরঙ্গিণী, সুবিস্তৃত অরণ্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক অন্তরায়ে জনপদগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এই সকল কারণে প্রাচীন সময়ে অনেক খণ্ড রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। এই খণ্ড রাজ্যের কোন ভূপতি যদি পুরু বা চন্দ্রগুপ্ত, অশোক বা শিলাদিত্যের ন্যায় পরাক্রান্ত হইতেন, তাহা হইলে তিনি পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহ অধিকার পূর্ব্বক সম্রাটের গৌরবান্বিত পদে আরোহণ করিতেন।

উদারস্বভাব বৌদ্ধ ভূপতিদিগের প্রবর্ত্তিত নিয়ম অনুসারে রাজ্যের সমস্ত কার্য্যনির্ব্বাহ হইত। লোকে কোন প্রকার গুরুতর করভারে নিপীড়িত হইত না। কেহ কাহাকে অমনি খাটাইয়া লইত না। যাহারা অট্টালিকানির্ম্মাণে বা অন্য কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইত, তাহারা আপনাদের পরিশ্রমের হার অনুসারে বেতন পাইত। জনসাধারণ আপনাদের পুরুষানুগত স্বত্বে কখন বঞ্চিত

হইত না। তাহারা আপনাদের ভরণ-পোষণের জন্য কৃষিকার্য্য করিত। কৃষকগণ উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ রাজাকে দিয়া সমুদয় আপনারা রাখিত। বাণিজ্যব্যবসায়ীদিগকে কুৎ ঘাটে সামান্য রকম কর দিতে হইত। সৈনিকেরা কেহ কেহ রাজ্যের সীমান্ত ভাগ, কেহ কেহ রাজপ্রাসাদ রক্ষা করিত। প্রয়োজন অনুসারে সৈন্য সংখ্যা বর্দ্ধিত হইত। পুরস্কার দিবার অঙ্গীকার করিয়া, সাধারণকে সৈনিক শ্রেণীতে নিবেশিত করা যাইত।

রাজকীয় ভূমি হইতে যে রাজস্ব পাওয়া যাইত, তাহার চারি ভাগ হইত। এক ভাগ রাজ্য ও ধর্ম্মসম্মত কার্য্যের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ থাকিত, দ্বিতীয় ভাগ মন্ত্রী ও শাসনসমিতির কর্ম্মচারিগণের ভরণপোষণের জন্য দেওয়া যাইত, তৃতীয়ভাগ জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও প্রতিভাশালীদিগকে পুরস্কার দিবার জন্য রাখা হইত, এবং চতুর্থ ভাগ "সন্তোষ-ক্ষেত্রে" উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ জমা থাকিত। শাসনকর্ত্তা, শান্তিরক্ষক ও রাজকীয় কর্ম্মচারী, আপনাদের ভরণ-পোষণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভূমি পাইতেন।"

নালন্দার বৌদ্ধ বিদ্যালয়।

হিউএন্ থ্ সঙ্গ্ যখন বুদ্ধগয়ায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন নালন্দায় যাইবার জন্য নিমন্ত্রিত হন। নালন্দা গয়ার নিকটে। কেহ কেহ বর্ত্তমান বড়গাঁওকে প্রাচীন নালন্দা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাহাহউক, নালন্দা বৌদ্ধদিগের পরম পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, এইস্থানে একটি আম্রকানন ছিল। কোন ধনাঢ্য বণিক উহা বুদ্ধকে দান করেন। বুদ্ধ এই আম্রকাননে অনেক দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ক্রমে এই স্থানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ধর্ম্মপরায়ণ বৌদ্ধ নৃপতিগণের দানশীলতায় ক্রমে এই বিদ্যামন্দির সম্প্রসারিত ও

উন্নত হইয়া উঠে। নালন্দার বিহার এই সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধবিদ্যালয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বৌদ্ধদিগের আঠারটি ভিন্ন ভিন্ন দলের দশ হাজার শ্রমণ এই স্থানে থাকিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্র, ন্যায়, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য ও চিকিৎসাবিদ্যার আলোচনা করিতেন। মনোহর বৃক্ষবাটিকায় এই মহাবিদ্যালয়ের পরিশোভিত ছিল। ছয়টি চারিতল বৃহৎ অট্টালিকায় শিক্ষার্থিগণ বাস করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য এক শতটি গৃহ ছিল। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রজ্ঞদিগের পরস্পর সম্মিলনের জন্য মধ্যস্থানে অনেকগুলি বড় বড় ঘর সুসজ্জিত থাকিত। মহারাজ শিলাদিত্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদিগের আহার, পরিধেয় ও ঔষধাদির সমস্ত ব্যয়নির্ব্বাহ করিতেন। নগরের কোলাহল এই স্থানের শান্তি ভঙ্গ করিত না, সাংসারিক প্রলোভন উহার পবিত্রতা বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইত না। শিক্ষার্থিগণ এই পবিত্র শান্তিনিকেতনে প্রশান্তভাবে শাস্ত্রচিন্তায় নিবিষ্ট থাকিতেন। নালন্দার বিদ্যালয় কেবল বাহ্যসৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল না, অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যেও উহা ভারতবর্ষে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। উহার শিক্ষকগণ জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ ছিলেন, এবং উহার শিক্ষার্থিগণ শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রচিন্তায় ভারতবর্ষে প্রতিপত্তিসঞ্চয় করিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ বিদ্যামন্দিরের প্রধান অধ্যাপকের নাম শীলভদ্র। ইনি কেবল বয়সে বৃদ্ধ ছিলেন না, শাস্ত্রজ্ঞানেও বৃদ্ধ বলিয়া সাধারণের নিকট সম্মানিত ছিলেন। সমস্ত শাস্ত্রই ইঁহার আয়ত্ত ছিল, অসাধারণ ধর্ম্মপরতায়, অসাধারণ অভিজ্ঞতায় ও অসাধারণ দূরদর্শিতায় এই বর্ষীয়ান্ পুরুষ নালন্দার বিদ্যালয় অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

হিউএন্ থ্‌ সঙ্গ্‌ ভারতীর এই লীলাভূমিতে যাইতে নিমন্ত্রিত হন। তিনি অভিজ্ঞতাসংগ্রহ মানসে যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া,

ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাহা শ্রমণদিগের অবিদিত ছিল না। নালন্দার শ্রমণগণ এই প্রসিদ্ধ পরিব্রাজকের পরিচয় লইতে সাতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারা হিউএন্ থ্ সঙ্গ্‌কে আদরসহকারে আহ্বান করিলেন। চারি জন অভিজ্ঞ শ্রমণ নিমন্ত্রণ-পত্র লইয়া হিউএন্ থ্ সঙ্গের নিকট উপস্থিত হইলেন। হিউএন্ থ্ সঙ্গ্ বিনম্রভাবে নিমন্ত্রণ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত নালন্দায় আসিলেন। বিদ্যালয়ে প্রবেশসময়ে দুই শত জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রমণ আপনাদের প্রসিদ্ধ অতিথিকে যথোচিত অভ্যর্থনাসহকারে গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদের পশ্চাতে বহুসংখ্য বৌদ্ধ, কেহ ছত্র ধরিয়া, কেহ নিশান উড়াইয়া, কেহ সুগন্ধি পুষ্পসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া, কেহ বা গম্ভীরস্বরে অতিথির প্রশংসাগীতি গাইয়া, তাঁহাকে শতগুণে মহীয়ান্ করিয়া তুলিলেন। এইরূপ আদর ও সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইয়া, হিউএন্ থ্ সঙ্গ্ প্রথমে বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যক্ষের নিকট আসিলেন। শীলভদ্র বেদীতে বসিয়াছিলেন; হিউএম্ থ্ সঙ্গ্ বেদীর সম্মুখে আসিয়া বিনয়নম্রতার সহিত বর্ষীয়ান্ পুরুষকে অভিবাদন করিলেন। এই অবধি হিউএন্ থ্ সঙ্গ্ শীলভদ্রের শিষ্যশ্রেণীতে নিবেশিত হন। বিদ্যালয়ের একটি উৎকৃষ্ট গৃহে তাঁহাকে স্থান দেওয়া হয়। দশ জন লোক তাঁহার অনুচর হন, দুই জন শ্রমণ নিয়ত তাঁহার শুশ্রূষা করিতে থাকেন, মহারাজ শিলাদিত্য তাঁহার দৈনন্দিন ব্যয়নির্ব্বাহ করেন। হিউএন্ থ্ সঙ্গ্ এইরূপে সকলের আদরণীয় হইয়া পাঁচ বৎসর নালন্দার বিদ্যালয়ে ছিলেন, পাঁচ বৎসর মহাপ্রজ্ঞ শীলভদ্রের পদমূলে বসিয়া পাণিনির ব্যাকরণ, ত্রিপিটক ও ব্রাহ্মণদিগের সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলেন। এখন এই পবিত্র বিদ্যামন্দিরের পূর্ব্বতন সৌন্দর্য্য নাই। কালের কঠোর আক্রমণে নালন্দা এখন ভগ্নদশায় পতিত রহিয়াছে।

সন্তোষক্ষেত্র।

খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর "সন্তোষ-ক্ষেত্রের" উৎসব ভারতের ইতিহাসের একটি প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। এই সময়ে মহারাজ শিলাদিত্য এই মহোৎসব সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে পাঁচ বার এই উৎসবকার্য্য যথাবিধি সম্পাদিত হইয়াছিল। হিউএন্ থ্ সঙ্ যখন নালন্দায় ছিলেন, তখন ষষ্ঠ বার এই অনুষ্ঠান হয়। গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থল পবিত্র প্রয়াগ এই মহোৎসবের ক্ষেত্র। এই স্থানের পাঁচ ছয় মাইল পরিমাণের বিস্তীর্ণ ভূমিতে উৎসবকার্য্য সম্পন্ন হইত। দীর্ঘকাল হইতে এই ভূমি "সন্তোষ-ক্ষেত্র" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছিল। এই ক্ষেত্রের চারি হাজার বর্গ ফীটপরিমিত ভূমি গোলাপ ফুলের গাছে পরিবেষ্টিত হইত। পরিবেষ্টিত স্থানের বৃহৎ বৃহৎ গৃহে স্বর্ণ ও রৌপ্য, কার্পাস ও রেসমের নানাবিধ বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্য স্তূপাকারে সজ্জিত থাকিত। এই বেষ্টিত স্থানের নিকট ভোজনগৃহ সকল বাজারের দোকানের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে শোভা পাইত। এই সমস্ত গৃহের [illegible] এক-টিতে [illegible]বারে প্রায় সহস্র লোকের ভোজন হইতে পারিত। [illegible]সবের অনেক পূর্ব্বে ঘোষণা দ্বারা, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, নিরাশ্রয়, দুঃখী, পিতৃমাতৃহীন, আত্মীয়বন্ধুশূন্য, নিঃস্ব ব্যক্তিদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পবিত্র প্রয়াগে আসিয়া দান গ্রহণের জন্য, আহ্বান করা হইত। মহারাজ শিলাদিত্য আপনার মন্ত্রী ও করদ রাজগণের সহিত এই স্থানে উপস্থিত থাকিতেন। বল্লভীরাজ ভাস্করবর্ম্মা এই করদ রাজগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। এই দুই করদ রাজ ও মহারাজ শিলাদিত্যের সৈন্য সন্তোষক্ষেত্রের চারি দিক বেষ্টন করিয়া থাকিত। ধ্রুবপতুর সৈন্যের পশ্চিমে বহুসংখ্য

অভ্যাগত লোক আপনাদের পটবাসস্থাপন করিত। এইরূপ শৃঙ্খলা বিশেষ পারিপাট্যশালী ও সুবুদ্ধির পরিচায়ক ছিল। বিতরণসময়ে অথবা তৎপূর্ব্বে সন্তোষক্ষেত্রের রাশীকৃত ধন দুষ্ট লোকে আত্মসাৎ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় উহার চারি দিক সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত করা হইত। এই ক্ষেত্র গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলের অব্যবহিত পশ্চিমে ছিল। শিলাদিত্য আপনার সৈন্যগণের সহিত গঙ্গার উত্তর তীরে থাকিতেন। ধ্রুবপভু ক্ষেত্রের অব্যবহিত পশ্চিমে এবং ক্ষেত্র ও অভ্যাগত দলের মধ্যভাগে সৈন্যস্থাপন করিতেন। আর ভাস্করবর্ম্মা যমুনার দক্ষিণ তটে আপনার সৈনিক দল রাখিতেন।

অসীম আড়ম্বরের সহিত উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হইত। শিলাদিত্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিপোষক হইলেও হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা করিতেন না, তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভয়কেই আদরসহকারে আহ্বান করিতেন, এবং বুদ্ধের প্রতিকৃতি ও হিন্দু দেবমূর্ত্তি উভয়ের প্রতিই সম্মান দেখাইতেন। প্রথম দিন পবিত্র মন্দিরে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইত। এই দিনে সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য দ্রব্য [illegible]ত হইত, এবং স[illegible]ক্ষা সুখাদ্য দ্রব্য অতিথি অভ্যাগতদিগকে দেওয়া যাইত। দ্বিতীয় দিনে ব্রহ্মাণ্ডপাল[illegible] তৃতীয় দিনে পরমদেব শিবের মূর্ত্তি মন্দিরের শোভাবিকাশ করি[illegible] প্রথম দিনের বিতরিত দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ এই এক এক দিনে বিতরণ করা হইত। চতুর্থ দিন হইতে সাধারণ দানকার্য্য আরম্ভ হইত। কুড়ি দিন, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা, দশ দিন হিন্দু দেবতাপূজকেরা, দশ দিন উলঙ্গ সন্ন্যাসীরা দান গ্রহণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত দরিদ্র, নিরাশ্রয়, পিতৃমাতৃহীন ও আত্মীয়স্বজনশূন্য ব্যক্তিদিগকে ধন দান করা হইত। এইরূপে ৭৫ দিন পর্য্যন্ত উৎসবের কার্য্য চলিত। শেষ দিনে মহারাজ শিলাদিত্য

আপনার বহুমূল্য পরিচ্ছদ, মণিমুক্তা-খচিত স্বর্ণাভরণ, অত্যুজ্জ্বল মুক্তাহারপ্রভৃতি সমুদয় অলঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক চীরশোভী বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশপরিগ্রহ করিতেন। এই মহামূল্য আভরণ-রাশিও দরিদ্রদিগকে দান করা হইত। চীর ধারণ করিয়া, মহারাজ শিলাদিত্য যোড়হাতে গম্ভীরস্বরে কহিতেন, "আজ আমার সম্পত্তিরক্ষার সমুদয় চিন্তার অবসান হইল। এই সন্তোষক্ষেত্রে আজ আমি সমুদয় দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। মানবের অভীষ্ট পুণ্যসঞ্চয়ের মানসে ভবিষ্যতেও আমি এইরূপ দান করিবার জন্য আমার সমস্ত সম্পত্তি রাশীকৃত করিয়া রাখিব।" এইরূপে পবিত্র প্রয়াগে সন্তোষক্ষেত্রের উৎসব পরিসমাপ্ত হইত। মহারাজ মুক্তহস্তে প্রায় সমস্তই দান করিতেন। কেবল রাজ্য-রক্ষা ও বিদ্রোহের দমন জন্য হস্তী, ঘোটক ও অস্ত্রাদি অবশিষ্ট থাকিত।

পবিত্র প্রয়াগে,পবিত্রস্বভাব,চীনদেশীয় শ্রমণ এইরূপ মহোৎসব দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া, ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূপতিগণ আপনাদিগকে অনন্ত সন্তোষ ও অন্তিমে অনন্ত পুণ্যের অধিকারী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ধর্ম্মপরায়ণ নরপতিগণ ধর্ম্মসঞ্চয়মানসে প্রতি পঞ্চম বর্ষে এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন বটে, কিন্তু ইহার সহিত রাজনৈতিক বিষয়েরও কিয়দংশে সংশ্রব ছিল। ভারতের রাজগণ এই সময়ে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের একান্ত আয়ত্ত ছিলেন। ইঁহাদিগকে সকল সময়ে এই উভয় দলের পরামর্শ অনুসারে শাসনকার্য্যনির্ব্বাহ করিতে হইত। যাহাতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষের আবির্ভাব না হয়, যাহাতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণ সর্ব্বদা রাজ্যের মঙ্গলচিন্তা করেন, তৎপ্রতি রাজাদের দৃষ্টি ছিল। এই উৎসবে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভয়কেই সমান আদরের সহিত ধন দান

করা হইত, উভয়েই সমান আদরের সহিত পরিগৃহীত হইতেন। এ জন্য ইঁহারা সর্ব্বদা দানবীর রাজার কুশলকামনা করিতেন, এবং যে রাজ্যে এমন অসাধারণ ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, সে রাজ্যের উন্নতির উপায়নির্দ্ধারণে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিতেন। এ দিকে সাধারণেও এই অসাধারণ ব্যাপার দেখিয়া রাজাকে মহতী দেবতা বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। এইরূপে রাজা সাধারণের মনের উপর আধিপত্যস্থাপন করিতেন। এতদ্ব্যতীত যে সকল সাহসী দস্যু রাজার ধনে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়া, শেষে রাজ-সিংহাসনগ্রহণে উদ্যত হয়, তাহারা সন্তোষক্ষেত্রের দানে রাজার অর্থাভাবপ্রযুক্ত আপনাদের সাহসিক কার্য্যে নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট থাকিত। এই সকল কারণে রাজ্যের বলবৃদ্ধি হইত। এগুলি সন্তোষক্ষেত্রের রাজনৈতিক ফলের মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

হিন্দুদিগের উন্নতি।

ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যখন বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের আধিপত্য দেখা যাইতেছিল, তখন আর্য্যদিগের মানসিক ক্ষমতা চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে তাঁহাদের অপূর্ব্ব প্রতিভার ক্রমে বিকাশ হইতে থাকে। তাঁহারা অভিনব বিষয়ে উদ্ভাবনা দেখাইয়া, সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে থাকেন। জ্ঞানভাণ্ডারের এক দিকে প্রতিভা ও গবেষণার আলোক বিকাশ পাইলে, ক্রমে অন্যান্য দিকও উহার আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, এবং লোক-সমাজের এক দিকে উদ্যম, অধ্যবসায় ও কার্য্যকারিতার স্রোত প্রবাহিত হইলে, ক্রমে সেই স্রোত সমস্ত সমাজে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। উপস্থিত সময়ে ভারতবর্ষের ঠিক এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। এই সময়ে সমাজের সকল বিভাগেই অবিচ্ছিন্ন উদ্যম ও অধ্যবসায়ের

সঞ্চার দেখা যাইতেছিল। সকল বিভাগই যেন কোন অনির্ব্বচনীয় তেজের মহিমায় সর্ব্বদা কার্য্যতৎপর ছিল। এই সময়ে হিন্দুগণ বিস্তীর্ণ সাগরের তরঙ্গমালা অতিক্রমপূর্ব্বক বালী ও যবদ্বীপে আধিপত্যস্থাপন করেন, আরব ও মিশরের সহিত বাণিজ্যব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে আপনাদিগকে পৃথিবীর বরণীয় করিয়া তুলেন। ইঁহাদের দূতগণ রোমের সম্রাটের নিকট আদরসহকারে পরিগৃহীত হন, ইঁহাদের কার্পাস বস্ত্র, মসলিন, রেসমী কাপড়, নীল, চিনি, হীরক, মুক্তাপ্রভৃতি আরব ও মিশরের বণিকগণ গ্রহণ করিয়া, আপনাদের দেশ সমৃদ্ধ করিতে থাকেন, ইঁহাদের শাসন-প্রণালীর শৃঙ্খলা ও নগরের পারিপাট্য দেখিয়া, বিদেশীয় ভ্রমণকারীরা ইঁহাদিগকে শতগুণে মহীয়ান্ করিয়া তুলেন। এ দিকে মহামতি আর্য্যগণ সারস্বতী শক্তির উপাসনাতেও বিশিষ্ট যত্নশীল হন। তাঁহারা জ্ঞানের মহিমায় ক্রমে সভ্য জগতের শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া উঠেন। এই সময়ে প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে জ্যোতিষ ও গণিতের অনুশীলন আরম্ভ হয়। বরাহমিহির এই সময়ে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রণয়ন করেন। আর্য্যভট্ট এই শাস্ত্রের উৎকর্ষবিধানে সচেষ্ট হন। ভাস্করাচার্য্য ও তদীয় দুহিতা লীলাবতী গণিতের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন। চরক ও সুশ্রুতদ্বারা চিকিৎসাবিদ্যার ভূয়সী উন্নতি হয়। কালিদাস, রঘুবংশপ্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, অভিজ্ঞানশকুন্তল প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া সকলের বরণীয় হন। অমরসিংহ অভিধানসঙ্কলন পূর্ব্বক সাহিত্যালোচনার পথ সুগম করিয়া দেন। এইরূপে ভারতবর্ষের এই গৌরবের সময়ে সকল বিষয়েরই ক্রমোৎকর্ষ হইতে থাকে। আরবেরা ভারতবর্ষ হইতে জ্ঞান-রত্ন আহরণ পূর্ব্বক আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করেন। ক্রমে রোমে উহার আলোক প্রসারিত হয়। এই সময়ে ইঙ্গলণ্ড ও ফ্রান্স অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন

ছিল, এই সময়ে জর্ম্মণির নিরক্ষর অসভ্যগণ আপনাদের আরণ্য ভূখণ্ডে মৃগয়ার আমোদে পরিতৃপ্ত হইতেছিল।

হিন্দুধর্ম্মের স্থায় স্থানবিশেষে বৌদ্ধ ধর্ম্মেরও যখন প্রাধান্য ছিল, তখন মধ্যভারতবর্ষে একটি হিন্দুরাজ্য সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। উজ্জয়িনী এই রাজ্যের রাজধানী, মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই রাজ্যের অধিপতি। বলা বাহুল্য, মহাকবি কালিদাস এই বিক্রমাদিত্যের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য বিদ্যার সমাদর করিয়া লোকপ্রসিদ্ধ হন। সাহসে ও পরাক্রমেও ইঁহার খ্যাতিবৃদ্ধি হয়। ইনি মধ্য এশিয়ার শক নামক জাতিকে পরাজিত করিয়া "শকারি" নামে অভিহিত হন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাব-কালনির্ণয়সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। সাধারণ মতে বিক্রমাদিত্য খ্রীষ্টাব্দের ৫৭ বৎসর পুর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার স্থাপিত "সংবৎ" চলিয়া আসিতেছে।

ব্রাহ্মণগণ আপনাদের ক্ষমতা বদ্ধমূল ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম অধঃকৃত করিবার জন্য অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় দেন। এই সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষ যেন কোন অনির্ব্বচনীয় তাড়িত বেগের প্রভাবে আন্দোলিত হইয়া উঠে। এই আন্দোলনসময়ে দুইটি মহাপুরুষ বৌদ্ধ ধর্ম্মের উচ্ছেদের জন্য বদ্ধপরিকর হন। ইঁহাদের একটির নাম ভট্টকুমারিল; অপরটি মহামহোপাধ্যায় শঙ্করাচার্য্য। কুমারিল ভট্ট মৈথিল ব্রাহ্মণ। খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে ইনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহার পরে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। শঙ্করাচার্য্য মলবারের ব্রাহ্মণ। খ্রীঃ নবম শতাব্দীতে ইনি বর্ত্তমান ছিলেন। অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানের সহিত ইঁহার অসাধারণ লিপিপটুতা ছিল। ইনি বহুসংখ্যক গ্রন্থ লিখিয়া অক্ষয় কীর্ত্তিসঞ্চয় করিয়াছেন। ইঁহার রসময়ী লেখনীর মহিমায় দর্শনশাস্ত্র উন্নত

ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে, এবং ইঁহার বিচারক্ষমতায় ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। হিমালয়ের পাদদেশে প্রসিদ্ধ কেদারনাথ তীর্থে শঙ্করাচার্য্যের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। শঙ্করাচার্য্য ৩২ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। এই বয়সের মধ্যে তিনি লোকাতীত তেজস্বিতাসহকারে প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পরাজিত করিয়া, আপনার মতস্থাপন করেন।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ডে মহামতি আর্য্যগণের বসতিবিস্তার হইতে লোকাতীত জ্ঞানসম্পন্ন, স্বাধ্যায়রত শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবসময় পর্য্যন্ত প্রাচীন সময়ের প্রধান প্রধান ঘটনা পূর্ব্বে যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তুতুষারমণ্ডিত হিমগিরির পাদদেশে, সপ্ত সিন্ধুর প্রসন্নসলিলবিধৌত শ্যামল ভূখণ্ডে, যখন ধর্ম্মনিষ্ঠ আর্য্যগণ বাস করিতেন, তখন তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞানে উন্নত, বিক্রমে অজেয় ও সাহসে অবিচলিত ছিলেন। ক্রমে তাঁহারা যে সকল জনপদে বসতিস্থাপন করিতে লাগিলেন, সেই সকল জনপদই তাঁহাদের প্রচারিত শাস্ত্রজ্ঞানে,তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত সভ্যতায়, গৌরবসম্পন্ন হইতে লাগিল। তাঁহাদের পরাক্রম কোথাও পর্য্যুদস্ত হয় নাই, তাঁহাদের উৎসাহ কোথাও মন্দীভূত হইয়া যায় নাই, তাঁহাদের উদ্যম কোথাও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে নাই। অনার্য্যগণ মহাপ্রভাব আর্য্যদিগের অসাধারণ সাহস, অপরিসীম বিক্রম, অলোকসাধারণ জ্ঞানমহিমায় বিস্মিত হইয়া, শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত তাঁহাদের নিকট অবনতমস্তক হইয়াছিল এবং তাঁহাদের সভ্যতায় ও তাঁহাদের জ্ঞানে ক্রমে উন্নত হইয়া, জীবনের মহত্তর কার্য্যসাধনে অগ্রসর হইতেছিল। আর্য্যগণ একতাসম্পন্ন হইয়া, সমান একাগ্রতার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন; তাঁহাদের কার্য্য কোথাও অসম্পন্ন থাকিত না। তাঁহাদের অধিষ্ঠানভূমি প্রচুরপরিমাণে শস্যসম্পত্তি দিয়া, তাঁহাদিগকে সম্প্রীত করিত।

সে সময়ে কৃষিকার্য্য অশ্রদ্ধা বা অবমাননার বিষয় ছিল না। ভূমিকর্ষণ, শস্যোৎপাদন, গবাদিজীবের প্রতিপালন, তখন পবিত্র কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণও আপনার ব্যবসায়ে অসমর্থ হইলে, কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। আর্য্যগণ সোমলতারসের বড় ভক্ত ছিলেন। ইহার ঘ্রাণে তাঁহারা তৃপ্ত হইতেন, ইহার স্পর্শে তাঁহারা অনির্ব্বচনীয় প্রীতিলাভ করিতেন, ইহার আস্বাদে তাঁহারা অভিনব উৎসাহে পূর্ণ হইয়া, গৌরবজনক কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইতেন। এইরূপ উৎসাহপূর্ণ, এইরূপ একতাসম্পন্ন, এইরূপ পরাক্রমশালী আর্য্যগণের যত্নে, বিশাল ভারতের বিভিন্ন ভূখণ্ড সভ্যতালোকে উদ্ভাসিত, শস্যসম্পত্তিতে পরিশোভিত ও জ্ঞানগৌরবে মহিমান্বিত হইয়া উঠে।

যে অতুলনীয় মহাকাব্যের অপার্থিব সৌন্দর্য্যের নিকট সকলে ভক্তি ও প্রীতির সহিত মস্তক অবনত করিতেছেন, তাহা আর্য্যঋষির রসময়ী লেখনী হইতে বিনির্গত হয়; যে দর্শনাদি শাস্ত্রে অলোকসাধারণ জ্ঞানগরিমার বিকাশ দেখিয়া, সকলে স্তম্ভিত হইতেছেন, আর্য্য ঋষিগণই তাহার প্রচার করেন; যে প্রভাবতী চিকিৎসাবিদ্যায় নানারোগের প্রতীকার হইতেছে, আর্য্যভূমিতেই তাহার বীজ উপ্ত হয়; "যে উজ্জয়িনীজনিতা কবিতাবল্লীর মধুময় কুসুম" স্বর্গীয় সৌগন্ধে সমগ্র সভ্য জগৎকে আমোদিত করিতেছে, আর্য্য কবি হইতেই তাহা বিকশিত হইয়া উঠে। মহাপ্রভাব আর্য্যগণ এইরূপ সকল বিষয়েই অসাধারণ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। শাস্ত্রজ্ঞানে, শিল্পচাতুরীতে, লৌকিক ব্যবহারে, তাঁহারা দক্ষতাপ্রকাশে ত্রুটি করেন নাই। আর্য্যসভ্যতায়, কেবল ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র পৃথিবীর উপকার সাধিত হইয়াছে। আর্য্যভূমির জ্ঞানালোকই ক্রমে প্রসারিত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ড আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। আর্য্যদিগের এই নিবাসভূমি—বিদ্যা ও সভ্যতার এই লীলাক্ষেত্র

ভারতবর্ষ অনেক বার অনেক বিদেশীয় জাতিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। এই আক্রমণে প্রথমে আক্রমণকারীর আধিপত্য দীর্ঘ-স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু শেষে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। শেষে আর্য্যাবর্ত্তে বিদেশীয়ের আধিপত্য স্থাপিত ও প্রসারিত হইয়া উঠে। নিম্নে এই সকল আক্রমণের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

ভারতাক্রমণ।

প্রকৃতির বিশাল রাজ্যে ভারতবর্ষ অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত। ইহার তিন দিকে অপার, অনন্ত জলরাশি, আর এক দিকে অনন্ত-সৌন্দর্য্যময়, অনন্ত শোভার ভাণ্ডার, অভ্রভেদী, অটল গিরিবর। সুতরাং ভারতবর্ষ প্রায় চারি দিকেই প্রকৃতিকর্ত্তৃক সুরক্ষিত। স্থল-পথে দুর্গম পার্ব্বত্য ভূমি, সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট অতিক্রম না করিলে, ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে পারাযায় না; আর জলপথে মহাসাগ-রের তরঙ্গবিক্ষোভী বারিরাশি অতিবাহন করিতে না পারিলে, ভারতের উপকূলে পদার্পণ করা যায় না। বাহির হইতে দেখিতে গেলে, ভারতবর্ষে প্রবেশ করা বহু আয়াস ও বহু কষ্টসাধ্য বলিয়া বোধ হয়। যেহেতু, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ প্রকৃতির দুর্গম ও দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরে সীমাবদ্ধ। এই ভীষণ প্রাকৃতিক প্রাচীর অতিক্রম করা বড় সহজ নহে। কিন্তু প্রকৃতি এত যত্ন করিয়া, যে ভারতবর্ষ আগুলিয়া রাখিয়াছেন, তাহাও চিরকাল বিভিন্ন জাতির আক্রমণের বহির্ভূত থাকে নাই। ইতিহাস দেখাইয়া দিতেছে ভারতবর্ষের ন্যায় আর কোন ভূখণ্ড, বহুবার বিদেশী আক্রমণকারীর পদানত হয় নাই। যে সুদূরবিস্তৃত পর্ব্বতমালা ভারতের শীর্ষদেশে বিরাট্ পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া, অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিতেছে, তাহার পশ্চিম দিকে

একটি গিরিসঙ্কট প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য বিশাল প্রাচীর ভেদ করিয়া দিয়াছে। আফগানিস্তান হইতে ঐ গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিতে পারিলেই ভারতবর্ষে উপনীত হওয়া যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতে, যাঁহারা রাজ্যবিস্তার, প্রভুত্বস্থাপন বা সম্পত্তিলুণ্ঠনের আশায় ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ঐ পথ অবলম্বন করিয়াছেন। ভারতবর্ষ ঐ পথে নয় বার আক্রান্ত হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহামতি শাক্য সিংহের জীবদ্দশায় ভারতবর্ষ একবার আক্রান্ত হয়। এই সময়ে পারশ্যের অধিপতি দয়াযুস্ হিস্তাস্পস্ সিন্ধু নদ পার হইয়া ভারতবর্ষের কয়েকটি জনপদ অধিকার করেন। দয়াযুস্ বোধ হয়, পূর্ব্বোক্ত গিরিসঙ্কট অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী আক্রমণ মাসিদনের অধিপতি সুপ্রসিদ্ধ সেকন্দর শাহ-কর্ত্তৃক হয়। এই আক্রমণপ্রসঙ্গেই প্রতীচ্য জগতে ভারতবর্ষের কথা লইয়া আন্দোলন ঘটে, ভারতবর্ষ এই সময় হইতেই ইউরোপীয়দিগের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিতে থাকে।

সেকন্দরের পর আফগানিস্তানের উত্তরে বল্‌খের অধিপতিগণ পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন। বল্‌খ্ তখন গ্রীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই স্থানের গ্রীক ভূপতিগণের কেহ কেহ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এইরূপে ভারতবর্ষ গ্রীক ভূপতিগণকর্ত্তৃক তৃতীয়বার আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণের ধারাবাহিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ইহার পর গজনির সুলতান মহমূদের আক্রমণ। পারসীকগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে ভারতবর্ষের তাদৃশ অনিষ্ট ঘটে নাই; দিগ্বিজয়ী সেকন্দর শাহ বীরশ্রেষ্ঠ পুরুকে পরাজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে ভারতবর্ষের স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হয় নাই, বাহ্লীকের গ্রীকগণ পঞ্জাব হইতে অযোধ্যার দ্বারে উপ-

নীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল অস্থির থাকে নাই, আরবগণও সিন্ধুদেশ অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও ঐ দেশ দীর্ঘকাল ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। কিন্তু সুলতান মহমূদের আক্রমণে ভারতবর্ষের সমূহ ক্ষতি হয়। মহমূদ খ্রীঃ ১০০১ অব্দে প্রথম বার ভারতবর্ষে উপনীত হন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনপদে আর্য্যদিগের অধিকারবিস্তার ইতিহাসের মধ্যে একটি প্রধান স্মরণীয় ঘটনা; যেহেতু উহাতে ভারতে সভ্যতার বিকাশ হয়, ধনসম্পত্তির উন্মেষ হয়, জ্ঞানগরিমা পরিস্ফুট হয়, সংক্ষেপে ভারতভূমি বিদ্যা ও সভ্যতার প্রসূতি বলিয়া জগতের সমক্ষে পরিচিত হইতে থাকে। সুলতান মহমূদের ভারতাক্রমণও একটি প্রধান স্মরণীয় ঘটনা; যেহেতু উহাতে ভারতে আসিবার পথ সাধারণের বিশিষ্টরূপে বিদিত হয়, সাধারণে ভারতবর্ষ সহজে আক্রম্য ও সহজে অধিগম্য বলিয়া মনে করিতে থাকে। এক বার দুই বার নয়, সুলতান মহমূদ উপর্য্যুপরি দ্বাদশবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এইরূপ বারংবার আক্রমণে পূর্ব্বোক্ত গিরিবর্ত্ম সাধারণের নিকট অনায়াসগম্য পথ বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। কলম্বসের পর হইতে নবাবিষ্কৃত ভূমণ্ডলে যাইবার পথ যেমন সকলে সহজ বলিয়া মনে করিতে থাকে, সুলতান মহমূদের পর হইতে বিদেশী জিগীষুগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করাও তেমন সহজ ভাবে। আমেরিকার পক্ষে যেমন কলম্বস্, ভারতবর্ষের পক্ষে তেমন সুলতান মহমূদ। কলম্বস্ আমেরিকার আবিষ্কার করিলেই, অনেকে আত্লান্তিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া, প্রকৃতির সেই ফলসম্পত্তিশোভিত রমণীয় রাজ্যে যাইতে থাকেন। ক্রমে আমেরিকার আদিম নিবাসিগণ বিদেশীয়দিগের পদানত হয়। আর সুলতান মহমূদ ফিরিয়া গেলেই, অনেকে সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট পার হইয়া ভারতবর্ষে আসিতে থাকেন। বিদেশীয়দিগের এই সংঘর্ষে, বিদেশীয়

সৈন্যপ্রবাহের এই ভীষণ অভিঘাতে, ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়।

সুলতান মহমুদের পর মহম্মদ গোরী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের ফল ভারতে মুসলমানরাজত্বের সূত্রপাত। সুলতান মহমুদ ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াই নিরস্ত ছিলেন, মহম্মদ গোরী ভারতে মুসলমানরাজ্যের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করিয়া যান। দৃশদ্বতীর তীরের মহাযুদ্ধে পৃথ্বীরাজের পতন হইলে, মহম্মদ গোরীর ক্রীতদাস ও সেনাপতি কোতবদ্দিন দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণ করেন। ভারতে মুসলমানদিগের আধিপত্য কোতবদ্দিন হইতে আরম্ভ হয়।

ভারতে পাঠানরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে, তিমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এই সময়ে তগলকবংশীয় মহম্মদ তগলক দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতবর্ষ অধিকার করা তিমুরলঙ্গের ভারতাক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল না। উহার প্রধান উদ্দেশ্য সর্ব্বধ্বংস ও সর্ব্বনাশ। এই উদ্দেশ্য সর্ব্বাংশে সফল হইয়াছিল। তিমুর শতদ্রুর তটদেশ হইতে পথবর্ত্তী দেশসকল লুণ্ঠন করিতে করিতে দিল্লীতে উপস্থিত হন। মহম্মদ তগলক গুজরাটে পলায়ন করেন। দিল্লী অধিকৃত, বিলুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়। অধিবাসিগণ তরবারির মুখে সমর্পিত হইতে থাকে। এইরূপে বিপ্লবময় উদ্দেশ্য সাধনের পর, তিমুর কাবুল দিয়া, আপনার দেশে প্রতিগমন করেন।

ক্রমে পাঠানরাজত্বের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া আইসে, ক্রমে পাঠানরাজগণ ক্ষমতাশূন্য হইয়া পড়েন। বাবর শাহ এই সময়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া মোগলরাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। মহম্মদ গোরী যাহার সূত্রপাত করেন, বাবর ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ তাহা সম্প্রসারিত ও সুশৃঙ্খল করিয়া তুলেন। ভারতে মোগলরাজত্ব

পাঠানরাজত্ব অপেক্ষা সুদৃঢ় ও সুব্যবস্থিত। বাবর আত্মবিগ্রহে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, শান্তিলাভ ও সমৃদ্ধিবৃদ্ধির আশায়, পঞ্জাবের মুসলমান শাসনকর্ত্তার পরামর্শে, আফগানিস্তান হইতে পূর্ব্বোক্ত সঙ্কীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম করিয়া, ভারতবর্ষে উপনীত হন। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া নির্ব্বিবাদে রাজত্বস্থাপন করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে পানিপথের যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী এব্রাহেম লোদীকে পরাজিত করিয়া, দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে হয়। আর্য্যশাসনে ও আর্য্যসভ্যতায় যেমন বিজিত অনার্য্যদিগের অনেক উপকার হয়, মোগল রাজত্বের পূর্ণ বিকাশে তেমন নিপীড়িত ভারতবর্ষীয়দিগেরও অনেক অংশে উপকার ও শান্তিলাভ হইয়া থাকে। বাবরের রোপিত বীজ আকবরের সময়ে ফলপুষ্পযুক্ত প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হয়। তাপদগ্ধ ভারতবর্ষীয়গণ এই তরুবরের শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহারা এই আশ্রয়স্থলে সমবেত হইয়া, শান্তিলাভে একবারে হতাশ হয় নাই। ইহাদের অনেকের জ্বালাযন্ত্রণা দূর হয়, অনেকে বাসনার পরিতৃপ্তিতে, কৃতজ্ঞতার আবেশে, প্রফুল্ল হইয়া, "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" ধ্বনিতে চারি দিক কম্পিত করিয়া তুলে। সুতরাং বাবরের আক্রমণে ভারতবর্ষের কিয়দংশে উপকার হয়। ইহাতে আপাততঃ দীর্ঘকালব্যাপী অত্যাচার, অবিচারস্রোত অনেকাংশে নিরুদ্ধ হইয়া আইসে। পাঠান-রাজত্বে ভারতবর্ষীয়েরা যে শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল, আকবর বা শাহজঁহার রাজত্বে সে শৃঙ্খলের বন্ধন শিথিল হয়। ভারতবর্ষীয়েরা অনেকাংশে স্বাধীনতার সুখভোগ করিতে থাকে। পরজাতির অধীন হইলেও আকবরশাসিত ভারতবর্ষকে স্ব-তন্ত্র বলা যাইতে পারে।

পাঠান-রাজত্বের ভগ্নদশায় যেমন তিমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া অনেক অর্থ অপহরণ ও অনেক মনুষ্য নাশ করেন,

মোগলরাজত্বের ভগ্নদশায়ও তেমন আর দুইজন আক্রমণকারী আফগানভূমি হইতে ভারতে সমাগত হন। ইঁহাদের একজন নাদিরশাহ; অপর জন অহম্মদশাহ দোরুরাণী। নাদির পারশ্যের সিংহাসন অধিকার করিয়া ১৭৩৯ অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। আর মহম্মদ শাহ আফগানিস্তানের দোরুরাণীদিগের অধিনায়ক হইয়া, ১৭৬১ অব্দে ভারতে উপনীত হন। এই দুই আক্রমণও তিমুরলঙ্গের আক্রমণের ন্যায় সর্ব্বস্বান্তকর। সুতরাং ইহাতে ভারতবর্ষের কোন উপকার হয় নাই।

ভারতবর্ষকে এই সকল প্রধান প্রধান আক্রমণের গুরুতর ভার—সময়ে সময়ে অশ্রুতপূর্ব্ব দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার সহিতে হইয়াছে। রাজনৈতিক বিষয়ে বাবরের আক্রমণে ভারতবর্ষের কিয়দংশে উপকার হইয়াছে। যেহেতু ইহাতে জেতৃবিজিত-সম্বন্ধ অনেকাংশে শিথিল হয়। আকবরের রাজত্বে এই সম্বন্ধ প্রায় উঠিয়া যায়। বিজিত হিন্দু বিজেতা মোগলের সমকক্ষ হইয়া, সৈন্যপরিচালন, রাজ্যশাসন ও গুরুতর রাজনৈতিক বিষয়ে মন্ত্রণা দান করিতে থাকেন।

ভারতবর্ষ স্থলপথে এইরূপ বহুবার আক্রান্ত হইলেও, আক্রমণকারীর গতিনিরোধে সমুচিত ক্ষমতাপ্রদর্শন করে নাই। সুলতান মহমুদ মধ্য এশিয়ার সম্মুখে ভারতাক্রমণের দ্বার উদ্ঘাটিত করেন। এই দ্বার উদ্ঘাটিত হইবার পর, ভারতবর্ষকে বিদেশী আক্রমণকারীর নিকট সর্ব্বদা অবনত থাকিতে হইয়াছে। সুলতান মহমুদ ও মহম্মদ গোরীর সময়ে ভারতবর্ষ হিন্দুপ্রধান ছিল। স্বাধীন হিন্দু রাজগণ ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ডে আপনাদের স্বাধীনতারক্ষা করিতে ছিলেন। তখন ভারতবর্ষে কোনও পরাক্রান্ত বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষের উপকার হইয়াছিল। যেহেতু, তখন কাবুলী

কের গ্রীক ভূপতিগণ ভারতবর্ষে আধিপত্যস্থাপন করিতে সাহসী হন নাই। সুলতান মহমুদ বা মহম্মদ গোরীর সমকালে ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্ন রাজ্যের উপর কোন একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। তখন ভারতের অঙ্গসকল পরস্পর বিযুক্ত ছিল। ইহাতে বোধ হয়, অভিনব আক্রমণকারীর প্রয়াস সফল হইয়াছিল। যাহাহউক, মুসলমানগণ ভারতবর্ষের সমুদয় স্থলে আপনাদের ক্ষমতা বদ্ধমূল করিতে পারেন নাই। ইহাদের অনেকে বিলাসসুখে প্রমত্ত থাকিতেন, অনেকে অত্যাচারে অবিচারে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেন। এজন্য অন্তর্বিদ্রোহে রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ঘটিত। লোদীবংশের শেষ রাজা এব্রাহিমের সময়ে ভারতবর্ষের এরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল যে, স্থানান্তরের তাতার ভূপতিও মুক্তিদাতা বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা দৌলত খাঁর আহ্বানে বাবর ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া, প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া, দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণ করেন। মুসলমান ভূপতিগণের আক্রমণেই ভারতে মুসলমান-রাজত্বের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যায়। আর ইহার সংঘাতে শিবজির মহামন্ত্রে সঞ্জীবিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধঃপতন হয়। ভারতে প্রবেশের সেই অদ্বিতীয় দ্বার—সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম ঐ আক্রমণের পথও উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। মুসলমানের প্রথম দুই আক্রমণে ভারতের দুইটি প্রধান মুসলমানশক্তির অধঃপতন ঘটে। ইহার পর আর দুই আক্রমণে ভারতের শেষ মুসলমানরাজ্য ছিন্ন ভিন্ন ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের পরাজয় হয়। এই সকল আক্রমণের স্রোতও আফগানিস্তান হইতে প্রবাহিত হইয়াছিল। আওরঙ্গজেবের সংকীর্ণ রাজনীতির দোষে মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়, মোগলের শাসন ও মোগলের আধিপত্যের ক্রমে ক্ষয় হইতে থাকে। এই সময়ে নাদির শাহ আফগানিস্তান হইতে

প্রবলবেগে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। দিল্লী বিধ্বস্ত ও রাজকীয় ধনাগার বিলুণ্ঠিত হয়। নাদিরের আক্রমণের পর দিল্লীর সম্রাটগণ আর পূর্ব্বগৌরবের অধিকারী হইতে পারেন নাই। যে শরীরী রোগজীর্ণ হইয়া, শোচনীয়ভাবে কালাতিপাত করিতে-ছিল, তাহা এই আক্রমণেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রবল প্রতাপ। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত তাহাদের বীরদর্পে কম্পিত হইতেছিল। এই প্রবল প্রতাপ ও এই বীরদর্পের অধঃপতন অহম্মদ শাহ দোর্‌রাণীর আক্রমণে ঘটে। অহম্মদ শাহ আফগানিস্তান হইতে আসিয়া ১৭৬১ অব্দে পানিপথের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য পরাজিত করেন। এই সময়ে ইঙ্গরেজেরা বাঙ্গালায় আপনাদের আধিপত্য বদ্ধমূল করিতে ছিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মুসলমানের প্রথম দুই আক্রমণে দুইটি মুসলমানশক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। তিমুরলঙ্গের আক্রমণে মহম্মদ তুগলকের রাজত্ব বিলুপ্ত হয়, বাবর শাহের আক্রমণ-প্রবাহে লোদীবংশীয়দিগের রাজত্বের শেষ চিহ্ন বিধৌত হইয়া যায়। সুতরাং মুসলমান ভারতে কেবল হিন্দুশক্তিই সঙ্কুচিত করে নাই, মুসলমানশক্তিও বিনষ্ট করিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত আক্রমণ ব্যতীত আরবেরা কয়েকবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। আরবের সেনাপতি মোহালিব, সুলতান মাহমূদের আক্রমণের কিঞ্চিদধিক তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মুলতানে উপনীত হন। কথিত আছে, তিনি ঐ স্থান হইতে অনেককে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ইহার পর খলিফা ওমরের সময়ে আরবেরা জলপথে সিন্ধুদেশে পদার্পণ করে। কিন্তু তখন তাহারা দেশজয়ে প্রবৃত্ত হয় নাই। সিন্ধুদেশের সুন্দরী নারী-সংগ্রহ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। খ্রীঃ ৭১২অব্দে খলিফা ওয়া-লিদের সময়ে সিন্ধুদেশ মহম্মদ কাসেমকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। কাসেম

বোধ হয়, জলপথে আসিয়া সিন্ধুদেশ অধিকার করিয়া ছিলেন। ভারতবর্ষ জলপথে এই প্রথম বার আক্রান্ত হইলেও বিশেষ ক্ষতি-গ্রস্ত হয় নাই। কাসেমের মৃত্যুর পরেই সিন্ধু আবার স্বাধীন হয়।

যাহা হউক, সুলতান মহমুদ যেমন উত্তর দিক্ হইতে স্থলপথে ভারতবর্ষে আসিবার পথ উন্মুক্ত করেন, বাস্কোডি গামা তেমন ইউরোপ হইতে জলপথে ভারতে উপনীত হইবার পথ উদ্ঘাটিত করিয়া দেন। সুলতান মহমূদ মধ্য এশিয়ার সহিত ভারতবর্ষ সংযোজিত করিয়াছিলেন, সেকেন্দর শাহের পর বাস্কোডি গামা ইউরোপের সহিত ভারতের সংযোগসাধন করেন। সুলতান মহমূদ মহাপরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী ভূপতি; বাস্কোডি গামা একজন সামান্য নাবিক। সুলতান মহমূদ সৈন্যসামন্ত লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, বাস্কোডি গামা বাণিজ্যপ্রসঙ্গে ভারতে উপনীত হইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এই সামান্য নাবিকের আবিষ্ক্রিয়ায় কোনরূপ রাজনৈতিক ফলের উৎপত্তি হয় নাই। শেষে এ অবস্থার পরিবর্ত্ত হয়। এই আবিষ্ক্রিয়া হইতে শেষে ভারতবর্ষে প্রধান রাজনৈতিক বিপ্লব উপস্থিত হইতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজেরা ভারতবর্ষের বাণিজ্যে বিশেষ লাভবান্ হইয়াছিল। ঐ শতাব্দীর শেষে ওলন্দাজেরা পর্ত্তুগীজের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইঙ্গরেজ, বাস্কোডি গামার আবিষ্কৃত পথ অবলম্বন করিয়া, ভারতের উপকূলে উপনীত হন। এই সময়ে ওলন্দাজদিগের প্রাদুর্ভাব ছিল। ক্রমে পরিবর্ত্তনশীল সময়ের সহিত ওলন্দাজদিগের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি বাস্কোডি গামার আবিষ্ক্রিয়ার যেরূপ ফলভোগ করিয়াছিলেন, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাংশে ইঙ্গরেজ ও ফরাসী সেইরূপ ফলভোগে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে ভারতবর্ষ অরাজক অবস্থায় ছিল। নাদিরসাহের আক্রমণে মোগলসাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

পানিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়েরা হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। মোগল সম্রাট্ রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীভ্রষ্ট হইয়া, ঘোরতর অভ্যন্তরীণ বিপ্লবের স্রোতে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছিলেন। অরাজকতা, ইঙ্গরেজ ও ফরাসী, উভয়কেই ভারতবর্ষে আত্মপ্রাধান্যস্থাপনে প্রবর্ত্তিত করে। এইরূপে দুইটি প্রবল বণিকসম্প্রদায় ভারতে অধিকার-স্থাপনের আশায়, পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফরাসীর পরাজয় হয়। এক শতাব্দীর মধ্যে প্রায় সমগ্র ভারত ইঙ্গরেজের পদানত হইয়া উঠে।

বাস্কোডি গামার আবিষ্ক্রিয়া হইতে এইরূপ মহাব্যাপার সম্পন্ন হয়। সামান্য নাবিক যখন ঘোরতর কষ্ট ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর, ভারতবর্ষে আগমনের পথ আবিষ্কৃত করেন, তখন তিনি মনেও ভাবেন নাই যে, ঐ পথই এক সময়ে সুদূরবিস্তৃত ভারতবর্ষের অবস্থা পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবে। সুলতান মহমূদের অবলম্বিত পথ অপেক্ষা বাস্কোডি গামার আবিষ্কৃত পথ, ভারতে গুরুতর রাজনৈতিক ফলের বিকাশ করিয়া দিয়াছে। ইঙ্গরেজ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন নাই, ভারতে আপনাদের রাজশক্তির প্রতিষ্ঠার মানসে সৈন্যসামন্ত লইয়া মহাসাগর অতিবাহনে প্রবৃত্ত হন নাই। সুলতান মহমূদ বা মহম্মদ গোরী প্রভৃতির সহিত ইঙ্গরেজকে এক শ্রেণীতে নিবেশিত করা যায় না। ইঙ্গরেজ বাণিজ্যের জন্য এদেশে আসিয়া, এদেশের শাসনদণ্ড অধিকার করিয়াছেন। সময় ও অবস্থা, উভয়ই ইঙ্গরেজের অনুকূল হইয়াছিল। এই অনুকূলতায় ইঙ্গরেজের অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়। ইঙ্গরেজ ভারতের আক্রমণকারী না হইলেও ভারতে আপনাদের সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা। আয়তনে, পরিমাণে, ইঙ্গরেজের ভারতসাম্রাজ্য আকবরের প্রতিষ্ঠিত ও আওরঙ্গ-জেবের সম্প্রসারিত সাম্রাজ্যকেও অধঃকৃত করিয়াছে।

এখন ইঙ্গরেজের অধিকার ভারতবর্ষের অনেক উন্নতি হই-

তেছে। সর্ব্বব্যাপী অরাজকতাস্রোত অবরুদ্ধ হইয়াছে। প্রজাগণ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত ও রক্ষিত হইতেছে। কেহ কাহাকে নিপীড়িত করিতে পারিতেছেনা, কেহ কাহারও ধর্ম্মসম্মত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতেছে না, কেহ কাহারও সমক্ষে ন্যায়ের অবমাননা করিয়া, নিষ্কৃতিলাভ করিতেছে না। সমগ্র সাম্রাজ্য শান্তভাব শান্তিময় পথে পরিচালিত হইতেছে। ইঙ্গরেজ, এই বিশাল রাজ্যে ন্যায়ের শাসন অক্ষুণ্ণ রাখিতে নিরন্তর চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহাদের সৌরাজ্যসম্ভূত গুণগৌরব ইতিহাস হইতে কখনও স্খলিত হইবে না।

সম্পূর্ণ।